ভ্রমণশিল্পী বুদ্ধদেব বসু

কেতকী কুশারী ডাইসন

[বুদ্ধদেব বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৮শে নভেম্বর ২০০৮ তারিখে এই শিরোনামে কলকাতায় যে-স্মারক বক্তৃতাটি দিয়েছিলাম, তারই সঙ্গে আরও কিছু মালমশলা যোগ ক'রে এই প্রবন্ধটি দাঁড় করিয়েছি। ভাষণের বাচনভঙ্গিটা বদলাই নি।]

আজকে আমরা যাঁর জন্মশতবার্ষিকীর স্মরণে সমবেত হয়েছি, তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং তাঁর স্ত্রী প্রতিভা বসু 'ঘরকুনো' বিশেষণটি প্রয়োগ করেছিলেন। প্রতিভা তখন চলাফেরা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন, আর সবে হারিয়েছেন তাঁর স্বামীকে, যাঁর দুটো চলমান পা ছিলো তাঁর নিজের প্রতিবন্ধের ক্ষতিপূরক। তাঁর স্মৃতিকথা *জীবনের জলছবি*-তে প্রতিভা লিখেছেন যে তাঁর প্রতিবন্ধ নিয়ে তাঁর কোনো অভিযোগ ছিলো না, কারণ তাঁর যা কাজ তা তাঁকে ব'সে ব'সেই করতে হয়— 'এমনকি সে জন্য কোনো আপিসেও যেতে হয় না। সেই কাজটা যদি আমি করতে পারি তার চেয়ে বেশি আর কী দরকার ? তাছাড়া আমি স্বভাবতই ঘরে থাকা মানুষ, আনন্দ আড্ডা ঘরেই আমার আবদ্ধ। কিন্তু এই মানুষটি যিনি আরও বেশি ঘরকুনো তিনি ঘর ছেড়ে কেন চলে গেলেন সেটাই আমার ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাস্য।'

কারও কোনো স্বীকারোক্তিই যে প্রসঙ্গনির্বিশেষে আক্ষরিকভাবে নেওয়া যায় না তার প্রমাণ এই যে মাত্র কয়েক পাতা পরেই এই 'স্বভাবতই ঘরে থাকা' মহিলাটি, যাঁর 'আনন্দ আড্ডা' নাকি 'ঘরেই ... আবদ্ধ', বর্ণনা দিয়েছেন তিনি কিভাবে মানসিক অশান্তির তাড়নায় ঘর থেকে একটু পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব ক'রে ট্যুরিস্ট সেন্টারে ফোন ক'রে দীঘাতে একটা কটেজ বুক ক'রে একটি কুড়ি-বাইশ বছরের সেবিকাকে সঙ্গে নিয়ে বাসে ক'রে সেখানে চ'লে গিয়েছিলেন। এই বাড়ি ছেড়ে বেরোনো ছিলো তাঁর জিজীবিষার অঙ্গ। তিনি যে চলনশক্তি হারিয়েছেন, সেই ব্যাপারটাকে কোনো প্রতিবন্ধ হিসেবে মেনে নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এর পরেই আরও একটি ভ্রমণের বর্ণনা দিয়েছেন— কিভাবে সমস্ত হতাশা আর দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে অর্ধেক কর্মক্ষম শরীর নিয়েই

দুজন আত্মীয়ের সঙ্গে 'বীরের মতো গাড়ি ক'রে উত্তর ভারত ভ্রমণে' বেরিয়েছিলেন। সে কী-একখানা ভ্রমণ ! একজন সম্পূর্ণ সুস্থ তরুণ বা তরুণীর পক্ষেও তা হতো দুর্ধর্ষ এক অভিযান। প্রথমে কলকাতা থেকে ধানবাদ, তার পর পাটনা, কাশী, কানপুর, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, দেবপ্রয়াগ, দেরাদুন, মুসৌরী, কর্বেট পার্ক।

অর্থাৎ, নেহাৎ ঘরকুনো তিনি ছিলেন না। ছিলেন না সেই মানুষটিও, যাঁকে তিনি আখ্যায়িত করেছেন তাঁর চাইতেও বেশী ঘরকুনো ব'লে। আসলে দুজনেই লেখক ছিলেন ব'লে ঘরে ব'সে কাজ করার সঙ্গে তাঁদের জীবনের একটা আবশ্যিক সম্পর্ক ছিলো, আবার দুজনেই কিন্তু বেড়াতেও বেশ ভালোবাসতেন। বুদ্ধদেবের যৌবনের বেশ কিছু নাম-করা কবিতা তো বেড়ানো নিয়েই। সেখানে ভুবনেশ্বর-পুরী-সমুদ্রস্নান-চিল্কা, দার্জিলিং-এভারেস্ট-কাঞ্চনজঙ্ঘা-টাইগার হিল, পাহাড়ী পথ, পুঞ্জ-পুঞ্জ তুষারের উপর চাঁদের আলো—এ-সমস্তই সগৌরবে বিরাজ করছে। তা ছাড়া আছে নারায়ণগঞ্জ থেকে স্টীমার ধরার আর পদ্মার বুকের উপর দিয়ে নারায়ণগঞ্জ-গোয়ালন্দ যাত্রার মনোহারী বর্ণনা। আমার এই আলোচনা প্রতিভাকে দিয়ে আরম্ভ করলাম এইজন্যে যে বিবাহিত জীবনে বুদ্ধদেবের বেড়ানোটা স্বচ্ছন্দ এবং আরামদায়ক হবে কিনা তা অনেকটা নির্ভর করতো প্রতিভা সঙ্গে যাচ্ছেন কিনা তার উপর, কিংবা তিনি সঙ্গে না গেলেও অন্য কেউ যত্ন নিয়ে তাঁর দেখাশোনা করছেন কিনা তার উপর।

একবার বুদ্ধদেবকে শারীরিক চেক-আপের জন্য ট্রপিকাল স্কুলে ভর্তি হতে হয়েছিলো। যাবার আগের দিন রাত্রে প্রতিভা তাঁর স্যুটকেসটা গুছিয়ে দিয়ে মনে করিয়ে দিলেন, ঘর থেকে কোথাও বেরোলে স্যুটকেসে যেন চাবি দিয়ে যান। প্রতিভা লিখেছেন, 'এ কথায় বুদ্ধদেবের হতচকিত অবস্থা। চাবি দিতে হবে ? সে কী ! চাবি আবার কেমন করে লাগাবো ? তারপরে ঘণ্টা দুই ধস্তাধস্তির পরেও চাবি লাগাতে শিখতে পারলেন না তিনি। ঘর্মক্ষরণই সার হলো।' বিশিষ্ট রোগীটি তিন দিন বাদেই পালিয়ে এসেছিলেন। 'বিশ্রী লাগে থাকতে সুতরাং পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিছুই হলো না।' সেই বছরের, অর্থাৎ ১৯৫৩-র শেষেই, পিট্‌স্‌বার্গের একটি মেয়েদের কলেজে কাজ নিয়ে বুদ্ধদেবের প্রথম বিদেশযাত্রা—একা-একা, সঙ্গে প্রতিভা নেই। একদিন অন্তর একদিন বাড়িতে চিঠি লিখতেন বুদ্ধদেব। সেইসব চিঠির মধ্যে 'কোনো ভালোলাগার সুর' নাকি থাকতো না : 'বাড়ি ছেড়ে আসা বিষয়ে প্রায় বালকদের মতোই তিনি কাতর।' আসলে ঐ কলেজটিতে

অ্যাকাডেমিক পরিবেশটা তাঁর মতো একজন বিদগ্ধ মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ছিলো না। তিনি সেখানে যথেষ্ট মনের খোরাক বা কর্মপ্রবর্তনা পান নি। সেটাই প্রধান কথা।

জন্মের পরেই মাকে হারিয়ে বালক বুদ্ধদেব বেড়ে উঠেছিলেন প্রশ্রয়দাত্রী মাতামহীর স্নেহনীড়ে। বিয়ের পর সেই নীড় থেকে চালান হয়েছিলেন পত্নীর হেফাজতে। তাঁর জীবনযাত্রার দৈনন্দিন খুঁটিনাটিগুলি প্রতিভা বসু এমনভাবে দেখে রাখতেন যে সেসব ব্যাপারে বুদ্ধদেবের সাংসারিক নিপুণতা বাড়ে নি। এ ব্যাপারে তাঁর অসহায়তা প্রৌঢ় বয়সে আরও বৃদ্ধি পায়। কোথাও যেতে হলে তাঁর টেনশনের অন্ত থাকতো না। তাঁর কন্যা দময়ন্তীর সাক্ষ্য অনুসারে, 'বাবার জন্য বাড়ি থেকে বের হওয়া ছিলো এক পর্ব। নিজের পরিবেশ ছেড়ে শান্তি পেতেন না।' তাঁকে লেখা তাঁর বাবার চিঠিপত্র সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনি আরও লিখেছেন :

> যে-কোনো ব্যাপারেই আগে থেকে এত উৎকণ্ঠায় থাকতেন বাবা যে সম্ভাব্য কষ্টটা আগেই ভোগ করে উঠতেন। ... কোথাও যাতায়াতের ব্যাপার হলে সেই উৎকণ্ঠা চরমে পৌঁছতো। আশঙ্কা প্রতি পদক্ষেপেই অঘটন ঘটবে—গাড়ি বাবাকে নিতে আসবে না, আরক্ষণ-তালিকায় বাবার নাম থাকবে না, জিনিস চুরি হয়ে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পরে যখন সব সুসম্পন্ন হতো ... তখন আবার দারুণ খুশি হতেন। ... আর এক অভ্যাস ছিলো তাড়াহুড়োর। ব্যবহারিক জীবনে ঠাণ্ডা মাথা, সুস্থির আমার মা। বাবা ছিলেন চলাচলতি ব্যাপারে দারুণ নার্ভাস। তাছাড়া বাইরে এত কম বেরোতেন যে আমরাও বাবাকে কোথাও একলা ছেড়ে দিয়ে স্বস্তি পেতাম না। আমার মনে আছে নাকতলায় বাবা কখনো পোস্টাপিস পর্যন্ত যেতে চাইলেও আমি জোর করে সঙ্গে যেতে চাইতাম। কলকাতা শহরের মধ্যেও বাবার চলাফেরার বিশেষ অভ্যেস ছিলো না বলে আমরা বাবা বিষয়ে ক্রমশই ভীষণ রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিলাম।

তবে মনে রাখতে হবে, এটা বুদ্ধদেবের প্রৌঢ়-বয়স-সংক্রান্ত বিবরণ। বরাবর ওরকম ছিলো না। ছাত্র-বয়সে বেশ কয়েকবার ঢাকা-কলকাতা করেছেন তিনি,

তার পর কলকাতায় খুঁটি গেড়েছেন। কলকাতাবাসের সেই পর্বে পকেটে বাসের মান্থলি টিকিট নিয়ে শহরটা চ'ষে বেড়িয়েছেন, তাঁর ভাষায় কলকাতায় 'খুব ঘূর্ণিত' হয়েছেন, শহরটার গভীর প্রেমে পড়েছেন। দময়ন্তী যে-সময়ের কথা বলছেন সে-সময়ে যানবাহনের ব্যাপারে ভারতে বিশৃঙ্খলা বাড়ছিলো। যে-কলকাতাকে বুদ্ধদেব আযৌবন ভালোবাসতেন, সেখানে আইনশৃঙ্খলা শিথিল হয়ে আসছিলো, যে-মানুষ একটু অসহায় তার পক্ষে নিরাপদে চলাফেরা করা আর সহজ ছিলো না। বুদ্ধদেব সেই ধরণের মানুষ, যিনি খুঁটিনাটির মর্ম বোঝেন ব'লেই কোথায় কোন্ জিনিসটা বিগড়ে যেতে পারে তা আগে থেকে আন্দাজ ক'রে নিয়ে টেনশনে ভুগতেন। এই পর্বে তাঁর ভ্রমণসংক্রান্ত উদ্বেগগুলো তাই কেবল তাঁর মনের খবর দেয় না, তাঁর অব্যবহিত পরিবেশে চলাফেরার নিরাপত্তা যে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠছিলো সেই সামাজিক তথ্যটিও আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়।

অথচ এই বুদ্ধদেবই—আজ যে-কথাটা বলতে আপনাদের সামনে এসেছি—বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ ভ্রমণশিল্পীদের একজন। দেশ আর বিদেশের ব্যাপক কাভারেজে তাঁর ভ্রমণরচনাগুলি আমাদের সাহিত্যের সম্পদ, রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণরচনাগুলির সঙ্গে তুলনীয় সাহিত্যিক প্রাপ্তি। আর কেবলই সুনির্দিষ্ট ভ্রমণরচনায় নয়, সাধারণভাবেই তাঁর সাহিত্যিক বিবর্তনে, শিল্পী ও চিন্তক হিসেবে তাঁর 'হয়ে ওঠা'য়, তাঁর কাব্যে-উপন্যাসে-মননে ভ্রমণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভ্রমণ তাঁর জন্যে কেবল অলস ভঙ্গিতে ছুটি কাটাবার উপায় নয়, তা জ্ঞান আহরণের পথও, তা গ্রন্থপাঠের সম্প্রসারণ। ভ্রমণ তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কে বর্ধিত করেছে, তাঁর আন্তর্জাতিকতাকে, মানবতান্ত্রিক দৃষ্টিকে, আর তুলনামূলক বিচারবিশ্লেষণের পদ্ধতিকে উত্তরোত্তর প্রখর করেছে। ভ্রমণ থেকে যে-শিক্ষা তিনি লাভ করেছেন, তা তাঁর সমস্ত রচনায় বিকীর্ণ হয়ে আছে আমাদের জন্য এক মূল্যবান উত্তরাধিকার হিসেবে। একটা গভীর, মৌল জায়গায় তিনি মোটেও কুনো ছিলেন না। যিনি আমাদের বোদলেয়র-রিল্‌কে-হ্যেল্ডার্লিন-পাস্তেরনাক চিনিয়েছেন, তাঁকে কি সত্যিই কুনো বলা যায় ? না, তিনি বরং তার উল্টোটাই ছিলেন। পৃথিবীটা তাঁর পল্লী ছিলো। আর কন্যাকে লেখা তাঁর চিঠিপত্র থেকে জানা যায়, যে-মানুষটি স্যুটকেসে চাবি দিতে পারতেন না, তিনিও হনলুলুতে একলা থাকার সময়ে অবস্থার চাপে—অর্থাৎ স্ত্রী সঙ্গে না থাকায়—বাধ্য হয়ে স্ত্রীর রেসিপি অনুযায়ী রোস্ট রেঁধেছিলেন, বাসন মেজেছিলেন, এমন কি ফ্রিজ ডিফ্রস্ট করেছিলেন ! দায়ে পড়লে মানুষ কী না শিখতে পারে !

প্রথমে দেশবিদেশের সাহিত্যপাঠের মাধ্যমে ব্যাপক মানসিক ভ্রমণ, তার পর সশরীরে ভ্রমণ তাঁকে বিশ্বনাগরিক করেছে, একই সঙ্গে দিয়েছে প্রজ্ঞা : বুঝতে দিয়েছে যে বিশ্বনাগরিকতা আর মাতৃভাষার প্রতি দায়বদ্ধতার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, একই মানুষ একই সঙ্গে বিশ্বনাগরিক আর মাতৃভাষার প্রতি দায়বদ্ধ হতে পারে। আমার নিজের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এই শিক্ষাটির জন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবেই ঋণী।

প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধদেব ছিলেন আজীবন ভ্রমণবিলাসী, ঘরের ভিতরে থেকেও বাহিরের স্বপ্নে বিভোর। এজন্যেই তাঁকে 'ভ্রমণশিল্পী' নামে চিহ্নিত করছি। বিদেশে তাঁর বিস্তৃত মানসিক ভ্রমণ আরম্ভ হয় কৈশোরে, যখন তাঁর আত্মীয় এবং সুহৃদ প্রভুচরণ গুহঠাকুরতা বিদেশে যান এবং সেখান থেকে ঢাকাবাসী কিশোর বুদ্ধদেবকে চিঠির পর চিঠি পাঠাতে আরম্ভ করেন। এ বিষয়ে বুদ্ধদেব বিস্তৃত প্রতিবেদন দিয়েছেন তাঁর *আমার ছেলেবেলা*-য়।

> আনন্দ আমার—যখন পড়ন্ত রোদে সুরকির রাস্তায় লাল ধুলো উড়িয়ে পোস্টাপিশের টকটকে লাল এক্কাগাড়িটা আমাদের দরজায় এসে থামে, আর খাকি-পোশাক-পরা কাঁধে-ব্যাগ-ঝোলানো ডাকপিওন আমার হাতে দিয়ে যায় আশ্চর্য সব তৈজস—নিয়মিতভাবে, প্রতি সোমবার।
>
> প্রভুচরণের প্রবাসকালে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিলো নিরবচ্ছিন্ন। অবিরাম আমি লিখে যাচ্ছি, অবিরাম তাঁর চিঠি পাচ্ছি। ... বস্টন থেকে, লস এঞ্জেলিস থেকে, সান্টা ফে থেকে—পুলম্যান-ট্রেনের কামরা থেকে কখনো—তারপর লণ্ডন রোম প্যারিস বার্লিন স্টকহল্‌ম থেকে আসছে তাঁর চিঠির পর চিঠি—আর সেই সঙ্গে নানা দেশের বই, আর মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা—রাশি-রাশি—বিচিত্র। তাঁর চিঠি হাতে পাওয়ার মুহূর্ত থেকে আমার সম্ভোগ শুরু হ'য়ে যায় : সারি সারি বিদেশী ডাকটিকিট, ইস্ত্রি-করা কাপড়ের মতো কড়কড়ে কাগজ ; কত অচেনা ভাষায় রাস্তার নাম, হোটেলের নাম—আর ভিতরে কত গল্প, কত নতুন খবর, কত স্নেহসম্ভাষণ ! বই আসে[—]ইবসেন, ম্যাটারলিঙ্ক, গোর্কী, আণ্ড্রীয়েহ্, অস্কার ওয়াইল্ড, শ্যন ও'কেইসি, সমকালীন মার্কিন কবিতার সংকলন, আসে ন্যুয়র্কে মস্কো আর্ট থিয়েটারের অভিনয়-ঋতুর চিত্রময় অনুষ্ঠানলিপি, চিঠির মধ্যে সংবাদপত্রের কর্তিকা—পাভলোভার নৃত্য,

> ডুজ়ের অভিনয়, শোপ্যাঁর সংগীত বিষয়ে আলোচনা। এর মধ্যে যা-কিছু আমি ঠিকমতো বুঝি না সেগুলিরও কিছু দেবার থাকে আমাকে—বইগুলোর গায়ে উন্মাদক এক গন্ধ, মুদ্রণের প্রসাধন, ছবি, আর অনেক দূর দেশের বাতাসের ছোঁওয়া। পুরো পাশ্চাত্ত্য জগৎ, ক্যালিফর্নিয়া থেকে রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ, সেখানকার শিল্প সাহিত্য জীবনযাত্রা, প্রাণবন্ত ভূগোল, আমার চোখে-না-দেখা কিন্তু মনের মধ্যে বাস্তব-হ'য়ে-ওঠা কত নদী নগর নর-নারী—এ-ই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন প্রভুচরণ, আমার চোদ্দ থেকে ষোলো বছরের মধ্যে, আমি যখন একটি চারাগাছের মতো মাটির তলা থেকে উদ্গত হচ্ছি, চাচ্ছি আমার সরু-সরু ডালগুলোকে জগৎ-জোড়া আকাশের দিকে তুলে ধরতে।

ইচ্ছে ক'রেই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম, প্রভুচরণের সঙ্গে বিশ্বস্ত পত্রালাপের মাধ্যমে বিদেশভ্রমণ সম্পর্কে বুদ্ধদেবের ধারণাগুলো অল্প বয়সেই কী-আন্দাজ উঁচু তারে বাঁধা হয়ে গেছিলো সেই জিনিসটি বোঝাতে। কৈশোরেই যে-ছেলেটি এমন এক গুরুর কাছে ভ্রমণের মন্ত্রে দীক্ষা পেয়েছে, সে তো কখনো নিছক ট্যুরিস্ট হবে না। এমন নয় যে সে বেড়াতে বেরোলে ছুটি উপভোগ করতে অক্ষম হবে, কিন্তু ভ্রমণ তার কাছে সর্বদাই ব'য়ে আনবে অন্য এক প্রগাঢ় স্বাদ, সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু নতুন জ্ঞান অর্জনের অধীর প্রত্যাশা। শারীরিক অ্যাডভেঞ্চার উপেক্ষিত হবে না, বিশেষতঃ যৌবনে, তবে পরিণত বয়সের পর্যটনে আরও মূল্যান্বিত হবে মানসিক অ্যাডভেঞ্চার। অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ সম্ভোগকে বিস্রস্ত না ক'রেও এই দীক্ষিত পর্যটকের জন্য ভ্রমণের গায়ে জড়িয়ে থাকবে মননের চাদর, চলবে আত্মীকৃত অভিজ্ঞতাকে নিয়ে নিরন্তর নিদিধ্যাসনের প্রয়াস। আজকাল আমরা কত গর্ব ক'রে বলি যে আমরা বিশ্বায়িত যুগে বাস করছি, ই-মেইলে পত্রবিনিময় আর ইন্টারনেটে গিয়ে পড়াশোনা করা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কিভাবে বিশ্বায়িত ক'রে দিচ্ছে, কিন্তু আমাদের বোধ হয় আরও বিনয়ী হওয়া দরকার। বুদ্ধদেবের জবানবন্দি থেকে এই-যে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম, তা থেকে আপনারা বুঝতে পারছেন যে বিশ শতকের বিশের দশকেও এই ঢাকানিবাসী টীন-এজ ছেলেটির চেতনা কতটা মৌল অর্থে বিশ্বায়িত ছিলো, কিভাবে বিশাল বিশ্বটা তার রোমাঞ্চকর দ্যুতি না হারিয়েও তখনই তার কত কাছের, কত আপনার হয়ে গেছে। ই-মেইল আর ইন্টারনেট না-ই বা থাকলো, বিংশ শতাব্দীর প্রথম

চতুর্থাংশে আন্তর্জাতিক ডাকচলাচল কত নির্ভরযোগ্য ছিলো তা-ও আপনারা বুঝতে পারছেন। স্রোতের মতো চিঠি-পত্রিকা-কার্ড-বই আসছে, কিছু খোয়া যাচ্ছে না। নির্ভরযোগ্য ডাকব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্ব সম্পর্কে বিস্তৃত সুসমাচার বাঙাল ছেলেটির কাছে যিনি এনে দিচ্ছেন তিনি ছেলেটিরই এক আত্মীয় আর বন্ধু, বয়সে একটু বড়। মানসিক ভ্রমণের অনুষঙ্গে ছেলেটি পেয়ে যাচ্ছে সাবালক বৌদ্ধিক সাহচর্যের অনন্য স্বাদ। ঠিকই, এই প্রতিবেদন বুদ্ধদেব দিয়েছেন পরিণত বয়সে। কিন্তু নিজের বালকবয়সে অর্জিত এই পরোক্ষ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার যে-মূল্যায়ন তিনি করেছেন তা তাঁর পরবর্তী বিবর্তনকে বুঝতে অশেষ সাহায্য করে আমাদের। ব্যাপারটা তিনি নিজে যেভাবে বুঝেছেন, তাঁর সেই বোঝাটুকু আমাদের জন্যে অবশ্যই মূল্যবান, অবশ্যই দিশারী।

সম্প্রতি বুদ্ধদেবের ভ্রমণগ্রন্থগুলি সংকলিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি-প্রকাশিত *বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধসমগ্র*-এর দ্বিতীয় খণ্ডে। সব ক'টি ভ্রমণপুস্তক দুই মলাটের মধ্যে সুসম্পাদিত অবস্থায় পাওয়া আমাদের পক্ষে একটা বিরাট লাভ, অধ্যয়ন করতে সুবিধা হয়। তা ছাড়া এই *প্রবন্ধসমগ্র*-এর প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলি আর রম্যরচনাগুলি। *উত্তরতিরিশ* নামে যে-বইটি সংকলিত হয়েছে, সেখানেও 'মহুয়ার দেশে' নামে একটি রচনা আছে, যেটি ভ্রমণকাহিনী। এ-ও সত্য, কোনো কোনো রচনা আদতে ভ্রমণধর্মী হিসেবে কল্পিত না হলেও সময়ের দুরন্ত ব্যবধানের দরুন পাঠকের সংবেদনে একটা নতুন জায়গা দেখার বোধ সৃষ্টি করে। একটা চেনা জায়গাও হঠাৎ অচেনা ব'লে প্রতিভাত হয়। এই অর্থে পাঠকচিত্তে একটা ভ্রমণের বোধ সঞ্চারিত করার ক্ষমতা অতীত কালের সাহিত্যের মধ্যে প্রায়ই থাকে। *উত্তরতিরিশ*-এর 'বড়ো রাস্তায় ছোটো ফ্ল্যাট' নামে প্রবন্ধটিতে এই প্রক্রিয়ায় আমি নিজে একটা অচেনা জায়গায় পৌঁছে যাই, যখন বুদ্ধদেব বর্ণনা করেন তাঁর রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের ফ্ল্যাট থেকে দেখা তেতাল্লিশের মন্বন্তরের কিছু বিশেষ ধরণের দৃশ্য। তখন দলে দলে কলকাতার দক্ষিণস্থ গ্রামগুলি থেকে সব বয়সের মেয়েরা কন্ট্রোলের দরে চাল কিনতে শহরের দোকানে আসছে। তাদের মধ্যে কদাচিৎ বৃদ্ধ পুরুষ থাকলেও যুবক বা প্রৌঢ় থাকে না, কেননা সাবালক পুরুষরা সারা দিন খেটে রোজগার করে, আর বাড়ির মেয়েরা একটু সস্তায় চাল কেনার জন্য শহরের দোকানের সামনে লাইন দেয়। তারা চাল কিনে নিয়ে গেলে তবে তাদের বাড়িতে হাঁড়ি

চড়বে। অনেকে আগের রাত্রে এসে দোকানের সামনে লাইন দিয়ে শুয়ে থাকে, যাতে সকালে দোকান খুললে তারা প্রার্থীদের মধ্যে প্রথম সারিতে থাকতে পারে। বুদ্ধদেব লিখেছেন, 'আমাদের দেশের এই মূঢ় অশিক্ষিত বিশৃঙ্খল জনসাধারণ— তারাও যে কিউ করে দাঁড়াতে, এমনকি শুতে পর্যন্ত শিখেছে, এটাই কি আমাদের পক্ষে কম গৌরবের বিষয় !' ১৯৪৩-এ আমি কলকাতায় ছিলাম না, পল্লীবাসিনীদের এই কিউ ক'রে শোয়ার দৃশ্য আমি দেখি নি, তাই এই বর্ণনা প'ড়ে আমার একটা নতুন জায়গা দেখার বোধ হয়েছে। যদিও আমি তখন নিতান্ত শিশু, ওরকম কিছু দেখলে আমার মনে থাকতেও পারতো। আমি তখন নদীয়া জেলার মেহেরপুর নামে একটা ছোট্ট জায়গায় ছিলাম। দুর্ভিক্ষ চলছে তা জানতাম। রোজ সকালে দেখতাম দলে দলে গ্রামবাসীরা পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে আলপথ ধ'রে খাদ্যের খোঁজে শহরে চলেছে। সেই দৃশ্য আমার পরিষ্কার মনে আছে।

আপনাদের অনুরোধ করবো বুদ্ধদেবের *প্রবন্ধসমগ্র*-এর দ্বিতীয় খণ্ডের চিত্তহারী ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি প'ড়ে দেখতে। পড়া মানেই আমাদের জন্য মানসিক ভ্রমণ, এবং এক অতীত যুগে ভ্রমণ। নীল আকাশের মতো উদার দুর্বার ভাষা, কবির কলমের গদ্য, কিন্তু ভাষা তো নিছক স্বয়ম্ভূ নয়, অনবরত তৈরি হয়ে ওঠে ভাবের সঙ্গে ছেদহীন টানাপড়েনে। আমরা দেখতে পাই নতুন নতুন অভিজ্ঞতার ধাক্কায় এক বুদ্ধিদীপ্ত মনের ভাবনাদের নিরলস ক্রমপ্রকাশ। অনুভব করার পাশাপাশি ক্রমাগত চিন্তা ক'রে চলেন এই পর্যটক। এই মনের ব্যাপারটার উপরে একটু জোর দিতে চাই। আমি যখন অক্সফোর্ডে প্রথম পড়তে যাই, তখন টিউটরদের কাছ থেকে প্রায়ই শুনতাম যে তাঁরা আমাদের দাখিল-করা টিউটোরিয়াল প্রবন্ধে আমাদের মন সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। 'We are interested in your mind'—বলতেন তাঁরা। ঐ মনের প্রকাশ থেকেই তাঁরা বুঝে যেতেন আমরা শিক্ষিত হয়ে উঠছি কিনা। এটা ষাটের দশকের কথা। জানি না এখনও শিক্ষকরা সেটাই খোঁজেন কিনা, না কি খোঁজেন অন্য জিনিস, তাত্ত্বিক সমালোচকদের কাছ থেকে আহৃত কেতাদুরস্ত বুলির বিন্যাস ? আমি নিজে এখনও একটা সাহিত্যের বই খুললেই সর্বাগ্রে গ্রন্থকারের মনটাকেই খুঁজে বেড়াই।

বইগুলি একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা করছি। পড়ার সময়ে মার্জিনে ভালো-লাগার অসংখ্য পেন্সিলের দাগ পড়েছে, কিন্তু সব তো আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। প্রথম দুটি বই হচ্ছে *আমি চঞ্চল হে* আর *সমুদ্রতীর* ; দুটিই ১৯৩৭-এ

প্রকাশিত, দুটিরই উপজীব্য নববিবাহিত বসু-দম্পতীর তিরিশের দশকের ভ্রমণ। *আমি চঞ্চল হে*-তে আছে ভুবনেশ্বর-পুরী-চিল্কা-কোনারক মিলিয়ে তাঁদের বিবাহপরবর্তী উড়িষ্যাভ্রমণ। ঐ সময়ে লেখা কিছু কবিতাও এই বইটির ভিতরে ধরানো আছে। এই ভ্রমণবৃত্তান্তটি পড়লে *নতুন পাতা*-র বেশ কিছু নাম-করা কবিতার পশ্চাদ্ভূমিটা পরিষ্কার হয়ে যায়। একটু আগে লেখার মধ্যে লেখকের মনকে দেখবার যে-তাগিদের কথা বললাম, সেই অনুষঙ্গে বুদ্ধদেবের একটি মত প্রণিধানযোগ্য। একটু চমক দিয়ে তিনি বলেন, '... আমরা যা দেখি, তা তো বাইরের কোনো বস্তু নয় ; নিজেদেরই ভিতরে যা থাকে, তা-ই শুধু আমরা দেখি। এবং নিজেদের ভিতরে যা নেই, বাইরে আমরা কখনোই তা দেখতে পাবো না।' কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, ঐ নিজেদের ভিতরটা কী ক'রে তৈরি হয় ? আমরা যতদূর জানি, হয় কিছুটা জন্মগত উত্তরাধিকারে, বাকিটা পরিপার্শ্বের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কিতে। তাই অল্প বয়সের শিক্ষা মানুষের পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধদেব সেখানে জিতে আছেন ব'লেই তাঁর দেখার চোখ তৈরি হয়ে আছে। এটা একটা চক্রাকার প্রক্রিয়া। নিজেদের ভিতরটাও সদানির্মীয়মাণ। বুদ্ধদেব অবশ্যই এ-ও জানেন, 'পৃথিবীর বেশির ভাগ লোক একেবারেই ভাবতে চায় না।' ভাবনা থেকে জনসাধারণের মন ভুলিয়ে রাখার বিপুল জড়বাদী আয়োজন সম্পর্কে ঐ তিরিশের দশকেই তিনি এমন একটি মোক্ষম কথা বলেছেন, যা একুশ শতকের বিশ্বায়িত অর্থনীতির যুগে আরও নির্মমভাবেই প্রযোজ্য : 'যাতে মানুষকে ভাবতে না হয় তার অসংখ্য বিচিত্র ব্যবস্থা যন্ত্র সম্ভব করেছে। এবং তারই নির্ভরে পৃথিবীর বেনেদের কোটিপতিত্ব। তোমরা মনখারাপ কোরো না, আমাদেরকে অনেক জিনিশ বেচতে হবে। আমাদের সব জিনিশ কেনো : ভাবনার দায় থেকে বাঁচবে।' আমরা তো অধুনা সেই যুগেই বাস করছি !

এই পুরোনো ভ্রমণকাহিনীতে এমন সব জিনিস আছে, যা পরবর্তী কালের বুদ্ধদেব বসুকে বুঝতেও খুবই সাহায্য করে। কলকাতার 'এক বিশাল, অন্ধকার আত্মা'র কথা বলেছেন এখানে, যা 'সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে কিছুদিন বাইরে কাটাবার পর ভোরবেলা হাওড়া কি শেয়ালদায় এসে পৌঁছলে। এইমাত্র-জল-দেয়া কালো চিকচিকে রাস্তা থেকে যে-একটি অদ্ভুত গন্ধ উঠে আসে, তা যেন পুরোনোকালের স্মৃতির মতোই প্রিয়—সময়ের হাতও কোনোদিন তাকে ছুঁতে পারবে না। মুহূর্তে কথা কয়ে ওঠে বুকের মধ্যে শহরের অন্ধকার, চিরন্তন আত্মা।' এখানে আমরা ১৯৫৩ সালে মহীশূরে ব'সে কলকাতার উদ্দেশে লেখা তাঁর

অসাধারণ ভালোবাসার কবিতাটির একটি বীজ-ভাবনাকে পেয়ে যাচ্ছি।

অনেক আশ্চর্য বর্ণনা ছড়িয়ে আছে এই বইটিতে, যা আজও মনে বিস্ময় সঞ্চার করে—পুরী যাবার পথে ভুবনেশ্বরে নেমে কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্নায় ছবির মতো দাঁড়িয়ে-থাকা লম্বা রেলগাড়ির আলো-জ্বালা জানলাগুলো ; শিশিরে-ভেজা ভোরবেলায় কঁকানো গরুর গাড়ি চ'ড়ে ভুবনেশ্বর যাত্রা—সেকালে গোযানই উড়িষ্যার 'প্রধান যান' ; মন্দিরের দেশ ভুবনেশ্বরে এখানে-ওখানে যেখানে-সেখানে ছড়ানো পাথরের 'ভাঙা-ভাঙা কবিতা'। 'মনে হয় এই দেশের লোকের এককালে মন্দির বানানো ছাড়া আর কোনো কাজই ছিলো না।' 'মন্দির বানানো ছিলো এ-দেশের লোকের উদ্দাম আনন্দের খেলা।'

অবশ্যই আছে সমুদ্রের কিছু লক্ষ্যভেদী বর্ণনা—বিকেলের 'বার্নিশ-করা কাঁসার মতো ঝকঝকে' সমুদ্র, যখন 'ঢেউগুলো জ্বলন্ত রোদ দিয়ে মাজা', রাত্রের 'কালো কালো ডাকাতের মতো কালো ঢেউগুলো', যারা হৈ-হৈ ক'রে আসে, যেন হোটেলের দরজা ভাঙতে চায়, ছাদে লাফিয়ে উঠতে চায়, সব লুঠ ক'রে নিতে চায়। আছে তৎকালীন ইংরেজ রাজত্বের ভারতবর্ষে রেল-পরিবহণের সুব্যবস্থার একটি চমৎকার ছবি, রেলগাড়ির রোমান্স। হয়তো হঠাৎ খেয়াল করলেন 'অনেক আঁকাবাঁকা লাইনের মাঝখানে এক কোণে দুটো নিঃসঙ্গ মালগাড়ি নিতান্ত অকারণে দাঁড়িয়ে আছে।' তৎক্ষণাৎ তাঁর মন এক বালক কবির মতো, যেন *পথের পাঁচালী*-র অপুর মতো এক রহস্যের পিছনে ধাবিত হয়। এদেরকে দিয়ে কারও কি কোনো দরকার নেই ? এরা খোয়া গেলে কারও কি কিছু এসে যায় না ? কে এদের হিসেব রাখছে ? কেউ কি এদের কথা ভুলে গেছে ? তারই উত্তরে জানতে পাই, 'অবশ্যি কোনো গোলমালই কখনো হয় না। গাড়িগুলো নিখুঁত হিসেবমতোই চলে, দাঁড়ায়, সার বাঁধে', বিশাল দেশটার বিভিন্ন প্রান্তকে একসূত্রে বেঁধে রাখে। পরবর্তী জীবনে ভ্রমণ নিয়ে বুদ্ধদেবের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ যে কিছু পরিমাণে এই সুব্যবস্থা থেকে স্খলনের পরিণাম, তা আন্দাজ করা যায়।

একটি অবিস্মরণীয় বর্ণনা গরুর গাড়িতে কোনারক যাবার পথে 'হাজার তারার আকাশের নিচে' নিয়াকিয়া নদীতে জোয়ার আসার। '... আকাশের প্রান্ত থেকে প্রান্ত জ্বলন্ত জীবন্ত তারায়-তারায় নিশ্বসিত। ... এত তারার চাপে আকাশ বুঝি ভেঙে পড়লো।' ধরা পড়েছে একজন কবির নিবিড় দেখা। বিলম্বিত লয়ে ভ্রমণের দর্শনটি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তাও একান্তই কবিজনোচিত : 'আমাদের বেড়ানোও আমার এই লেখারই মতো ; তার পৌঁছবার গরজ নেই,

পথে-পথে কেবলই নানা ছুতোয় সে দেরি করছে। এখানে একটু দাঁড়াও, ওখানে একটু দ্যাখো। কিসের গন্ধ লাগলো ; এলো স্মৃতির হাওয়া। ভাবনার কত রঙিন সুতো ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়ছে, জড়িয়ে যাচ্ছে পরস্পরে ; সেগুলোকে মেলানো যদি না যায় তো না-ই গেলো।' ভাবনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে উঠে আসে সমাজচিন্তার নানা টুকরোটাকরাও : 'আদর্শ সমাজ-সংগঠনের প্রধান শর্তই এই যে তাতে মানুষের উপার্জনের সঙ্গে আনন্দের সংগতি থাকবে।' এই কবিত্বময় দার্শনিকতা ভ্রমণসাহিত্যের এক বিশেষ আদরণীয় উপহার, যা রবীন্দ্রনাথেও আমরা পাই।

সমুদ্রতীর বইটির উপজীব্য গোপালপুর-অন্-সী আর ওয়াল্‌টেয়ারে বসু-দম্পতীর ভ্রমণ ; এবারে তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন তাঁদের প্রথম সন্তান। এই বইটিতে কৌতুকরস আর বিচিত্র ব্যক্তিতার মানুষের স্কেচ বেশী, আছে ভালো-মন্দ-দুঃসাহসী নানা ধরণের অভিজ্ঞতার আর অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। স্থানকালগত সামাজিক উপাদান এবং আঞ্চলিক জীবনযাত্রার ছবিগুলি ঐতিহাসিক মূল্যে অন্বিত। তবে অন্য ধরণের বর্ণনাও আছে। যেমন ওয়াল্‌টেয়ারের সমুদ্রের বর্ণনা, যা নাকি 'নিষ্ঠুর, ... ক্ষুধিত ও আহত, তিমির তপ্তরক্তের তাড়া-খাওয়া, হাঙরের ধারালো দাঁতে ছিঁড়ে-যাওয়া, ... শুধু জীবন্ত নয়, জান্তব ...'। কিংবা পূর্বঘাট পর্বতমালার, যা 'অন্তহীন, ক্লান্তিহীন'। দুই দিকে কেবল পাহাড়ের সারি, তার মাঝখান দিয়ে রেলের গতিপথ। চমকে উঠেছিলাম বুদ্ধদেবের একটি মন্তব্য প্রথমবার প'ড়ে—'একসঙ্গে যে দু-দিকেই তাকানো যায় না সেজন্য আপশোস হয়।' আমার মনে প'ড়ে গেছিলো জার্মানিতে আমার এক ট্রেনযাত্রা, সেই পথের একদিকে ছিলো সমুন্নত পর্বতমালা, অন্যদিকে গভীর উপত্যকার নিম্নে বহমান রাইন নদী। তখন ঠিক এই আফসোসটাই অনুভব করেছিলাম। আমি উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে মুহূর্তে মুহূর্তে ঘাড় বেঁকিয়ে দুই দিকই যতটা পারি দেখে নেবার চেষ্টা করছি, তা দেখে এক জার্মান বৃদ্ধা আমাকে বলেছিলেন, 'আমরা মনে করি এটা পৃথিবীর সুন্দরতম দৃশ্যগুলির মধ্যে একটি।' আর পূর্বঘাট সম্পর্কে বুদ্ধদেবের বক্তব্যের সারাংশ : 'প্রকৃতির প্রাচুর্য মানুষের কল্পনার চেয়েও বেশি।' ভ্রমণকাহিনী পড়ার এটা একটা অতিরিক্ত আনন্দ, যদি লেখক আর পাঠকের মনের তারে একটা সহরণন থাকে, তা হলে কোনো-কোনো পঠিত খুঁটিনাটি আমাদের নিজেদের ভ্রমণস্মৃতিকে টেনে আনে। বুদ্ধদেবের ভ্রমণবৃত্তান্তে এইরকম নানা অনুপুঙ্খ পেয়েছি, যেগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন লোকেশনে করা আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে ডেকে এনেছে। বা কোনো পঠিত টেক্সটকে। *সমুদ্রতীর*

বইটিতে রেলগাড়ির প্রশংসায় একটি রোম্যান্টিক প্যারাগ্রাফ আছে—'আশ্চর্য জিনিশ এই রেলগাড়ি ! সে যে আমাদের শুধু এক ঠিকানা থেকে অন্য ঠিকানায় নিয়ে যায় তা তো নয়, চেতনার এক স্তর থেকে অন্য স্তরেও বদলি করে ...'। এটি প্রায় অনিবার্যভাবে আমার মনের মধ্যে ডেকে এনেছে বুদ্ধদেবের সমকালীন ইংরেজ কবি স্টিফেন স্পেণ্ডরের 'দ্য এক্সপ্রেস' কবিতাটিকে। হতেও পারে যে ঐ অংশটা লেখার সময়ে কবিতাটা বুদ্ধদেবের মাথার মধ্যে ছিলো এবং তিনি সেটার দ্বারা কিছুটা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 'দ্য এক্সপ্রেস' যেহেতু ১৯৩২ সালে ছাপা হয়, তাই বুদ্ধদেব প'ড়ে থাকতেই পারেন ওটা। ত্রিশের দশকের ইংরেজ কবিদের দ্বারা বুদ্ধদেবদের প্রজন্ম অবশ্যই প্রভাবিত হচ্ছিলেন তখন।

আলোচ্য *প্রবন্ধসংগ্রহ :* ২-এ সংকলিত তৃতীয় ভ্রমণবৃত্তান্তটি হচ্ছে ১৯৪১ সালে প্রথম প্রকাশিত সুবিখ্যাত *সব-পেয়েছির দেশে*, যেখানে আছে দুই দফায় শান্তিনিকেতন-ভ্রমণ আর রবীন্দ্রসান্নিধ্য লাভের বিবরণ। এই বইটির একটি নতুন সংস্করণ ১৯৯৮ সালে দময়ন্তী বসু সিং-এর বিকল্প প্রকাশনী থেকে বের হওয়ার ফলে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গসমৃদ্ধ এই গুরুত্বপূর্ণ টেক্সটটি কিছু সমসাময়িক নতুন পাঠক লাভ করেছে। ইন্টারনেট পত্রিকা *পরবাস*-এ নন্দিনী গুপ্তর করা এর ইংরেজী অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে বেরোচ্ছে। সেটিও যাঁরা বাংলা পড়তে পারেন না তাঁদের মধ্যে তরঙ্গমালা সৃষ্টি করছে। ফিনল্যাণ্ডে এক রবীন্দ্রভক্ত তথা বুদ্ধভক্ত মহিলা আছেন, হান্নেলে পোহ্‌য়ানমিয়েস, যিনি বুদ্ধদেবের 'কলকাতা' কবিতাটির প্রেমে পড়েছেন। এটি তিনি আমার করা ইংরেজী অনুবাদ থেকে তাঁর মাতৃভাষা ফিনিশ-এ পুনরনুবাদ করেছেন। ইনি *পরবাস* পত্রিকায় *সব-পেয়েছির দেশে*-র অনুবাদের কয়েকটি কিস্তি প'ড়ে এতটাই অনুপ্রাণিত হন যে বুদ্ধদেবের সঙ্গে নিজের একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করেন। সেটিও *পরবাস*-এ প্রকাশিত হয়েছে। এ থেকে বইটির আকর্ষণী ক্ষমতা আন্দাজ করা যায়। আপনারা অনেকেই নিশ্চয় এই বইটির সঙ্গে পরিচিত, তাই এটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার হয়তো দরকার নেই। কেবল একটি ছোট্ট ডিটেলের উল্লেখ করি। এক জায়গায় বুদ্ধদেব বলছেন, রতন-কুঠিতে তাঁদের ঘরে পুবদিকে একটা মস্ত জানলা ছিলো, যেটা সাধারণতঃ বন্ধই থাকতো, কিন্তু এক তপ্ত দুপুরে প্রতিভা বসু হাওয়ার জন্যে সেটা খুলে দিলেন। তৎক্ষণাৎ দুরন্ত হাওয়ায় টেবিলের কাগজপত্র গেলো উড়ে, আর তাঁরা অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন পূর্বদিগন্তের 'এক নতুন দৃষ্টিহরণ দৃশ্য'। আফসোস করতে লাগলেন, জানলাটা আগে কেন খোলেন নি তাঁরা—'... এ-

দৃশ্য দিনের পর দিন চোখের সামনে প'ড়ে ছিলো, অযত্নে রুদ্ধ ক'রে রেখেছি।' আমি যেহেতু রতন-কুঠিতে বেশ কয়েকবার থেকেছি, আমার মনে তাই স্বতঃই প্রশ্ন জেগেছে, ১৯৪১ সালে ঠিক কেমন ছিলো পূর্বদিগন্তের সেই 'দৃষ্টিহরণ দৃশ্য' ? ঘটনাটা আমাদের জীবনের নানা অবস্থানমুহূর্তের রূপকও বটে, পড়ামাত্র চেতনায় চেনার ঝংকার তোলে।

প্রবন্ধসমগ্র : ২-এ সংকলিত চতুর্থ ভ্রমণগ্রন্থটি হচ্ছে *দেশান্তর*। এটি বর্তমান আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে। এই বইটির মধ্যে বুদ্ধদেবের ১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৬১-৬৫ পর্বের বিভিন্ন বিদেশভ্রমণের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে এবং এটি চার ভাগে বিভক্ত : 'আকাশযাত্রী', 'জাপান ও হনলুলু', 'আমেরিকায়', এবং 'য়োরোপে ও মিশরে'। শিরোনামগুলি স্থানিক প্রতিবেদনের বিশাল চালচিত্রের জানান দিচ্ছে। বক্তৃতার পরিসরের মধ্যে আকারে বড় এই বইটির প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ভ্রমণের এই বৃত্তান্তগুলির মূল্য দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, তিপ্পান্ন সালে প্রথম বিদেশ যাবার পর থেকে বুদ্ধদেবের সাহিত্যিক জীবনে এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হয়, তার পর ষাটের দশকের বিভিন্ন বিদেশপর্যটনের মাধ্যমে তাঁর বিশ্বনাগরিকতা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আত্মচেতনা আরও পরিণত এবং পরিশীলিত হয়। ফলে তাঁর বিদেশাহৃত অভিজ্ঞতাগুলি শেষ পর্বের বুদ্ধদেব বসুকে বুঝতে খুবই সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ, আজকাল কেবল আগেকার মতো এলিট শ্রেণীর একজন-দুজন নন, দুই বাংলা থেকে বহু মধ্যবিত্ত, এমন-কি নিম্নমধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী বাঙালীও নানা দেশে ভ্রাম্যমাণ এবং অভিবাসী হয়েছেন, পৃথিবী জুড়ে বাঙালীদের এক বৃহৎ ডায়াস্পোরা গ'ড়ে উঠেছে। বিশ্বের সঙ্গে আমাদের কারবার পাকাপোক্ত হয়েছে, সেই হাটের জুয়াখেলায় আমরা বাজি রেখেছি। কিন্তু পঞ্চাশের আর ষাটের দশকে এই বিপুল সচলতা ছিলো না। সেই যুগে ঐ দেশগুলো বুদ্ধদেবের মতো একজন বুদ্ধিজীবী ভ্রমণকারীর চোখে কেমন লেগেছিলো সেই কাহিনীর একটা বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য এখনকার সম্প্রসারিত প্রেক্ষাপটে নিশ্চয়ই আছে। তাই আপনাদের বিশেষভাবেই অনুরোধ করবো *দেশান্তর* বইটি যত্নসহকারে পড়তে। অভিজ্ঞতার স্রোত অনবরত তাঁর উপর দিয়ে ব'য়ে চলেছে, অনবরত তিনি তার বর্ণনা দিচ্ছেন, ভাষার প্রসাদগুণকে একটুও ক্ষুণ্ণ না ক'রে সেইসব অভিজ্ঞতার বিভিন্ন মাত্রাকে তাঁর বিদগ্ধ মনের গুঞ্জনসহ বিশ্লেষণ ক'রে চলেছেন, একটু আগে যা বলেছিলেন পরবর্তী অভিজ্ঞতার নিরিখে তাকে সংশোধন ক'রে নিচ্ছেন—এক

কথায়, ভ্রমণের বই পড়া যদি পরোক্ষ ভ্রমণ হয়, তবে এমন একটি মানুষকে এত বড় যাত্রায় সঙ্গী এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে পাওয়া আমাদের পক্ষে নীট লাভ।

পথ চলতে চলতে মত বদলে নেওয়ার দু'-একটি দৃষ্টান্ত দিই। চলার প্রথম খেপে আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রা ব্যাপারটা মোটেই ভালো লাগে নি তাঁর। সব কিছু যান্ত্রিকভাবে অত্যন্ত ত্বরিত গতিতে হয়ে যাচ্ছে, র'য়ে-স'য়ে উপভোগ ক'রে কোনো দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না, যেমন দেখা যায় তাঁর প্রিয় বাহন রেলগাড়ির জানলা থেকে। তার পর আল্পস্ পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করবার সময়ে তাঁর দৃষ্টির নীচে ফুটে উঠতে লাগলো এক অদ্ভুত দৃশ্য :

> পাহাড়ের গায়ে ধাপে-ধাপে আটকে আছে শাদা, ম্লান, পাঁশুটে মেঘ, যেন বাচ্চা-বাচ্চা ভেড়ার পাল পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে, কিংবা যেন অসংখ্য নধর শিশু পীনস্তনী, বিশাল কোনো মায়ের বুকে [বুক ?] আঁকড়ে পড়ে আছে। রোদ, মেঘ আর তুষারে মেশা শুভ্রতার এক বিচিত্র বিস্তার দেখতে-দেখতে চললাম। এরোপ্লেনের অনেক নিন্দে করেছি এতক্ষণ, যেন তারই মহৎ প্রতিহিংসাস্বরূপ সে হঠাৎ তার ঝুলি থেকে এই তুষার-দৃশ্যটি বের করে আমাকে দেখিয়ে দিলে। তখনকার মতো হার মানতে হলো।

পরমুহূর্তেই তাঁর মনে হলো যে এর মধ্যেও একটা ফাঁকি আছে। একটা অবিস্মরণীয় দৃশ্য দেখলেন বটে, যা কেবল আকাশযানই দেখাতে পারে, কিন্তু আল্পস্ পর্বতমালার স্বরূপ তো দেখা হলো না। তার কারণ, ঐ দেখায় পরিপ্রেক্ষিতের ভুল আছে। পাহাড় দেখতে হয় মাটিতে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে চোখ তুলে। এরোপ্লেনের জানলায় ব'সে নীচের দিকে তাকালে পর্বতের মর্ম বোঝা যায় না।

কিন্তু এর পরেও আরেক বিস্ময় তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'রে ছিলো, যা 'একেবারেই প্রত্যাশার বাইরে, বিশ্বাসের বাইরে, কল্পনার বাইরে। চোখে দেখেও মেনে নেয়া শক্ত, কিন্তু চোখে দেখে মানতেই হলো।' সূর্যাস্তের সময়ে লণ্ডন থেকে গ্লাসগোর অভিমুখে বহুবর্ণ মেঘের এক মায়াবী বিস্তারের উপর দিয়ে উড়তে লাগলেন তিনি—'মেঘের প্রান্তর, মেঘের সমুদ্র, মেঘের মরুভূমি। হলদে বেগনি ব্রাউন রঙের মেঘ, ধোঁয়ার মতো নীল, ধোঁয়ার মতো ধূসর, ছাইয়ের মতো শাদা, ছাইয়ের মতো কালো, টাটকা-সেঁকা পাঁউরুটির মতো লালচে, নিবে-আসা

কয়লার মতো একই সঙ্গে ফ্যাকাশে আর লাল। কোঁকড়া মেঘ, সরল মেঘ, লম্বা আর নিবিড় মেঘ, কোথাও ফাঁক নেই, কোথাও ঝুলে পড়েনি, একটু ঢিল হয়নি কোথাও—একটানা, অবিচ্ছেদ্য, অফুরন্ত, মাইলের পর মাইল।' তার পর এই প্রেক্ষাপটে, যেন আকাশের উপরে অন্য এক আকাশে উড্ডীন অবস্থায় দেখলেন এক দীর্ঘস্থায়ী সূর্যাস্তকে। এক দীর্ঘায়িত সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া, কেননা তিনি উড়ছেন উত্তরপশ্চিম দিকে, সূর্য যত হেলছে বিমানও ততই পশ্চিম দিকে স'রে যাচ্ছে এবং যেন সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরও ঊর্ধ্বে উঠছে, যাতে দৃশ্যটি হারিয়ে না যায়। এই দেখার ভিত্তিতে বুদ্ধদেব রচনা করেছেন শব্দমাধ্যমিক এক মেঘ আর আলোর সিম্ফনি, যার স্বাদ অনন্য :

> নানা রঙে বোনা মেঘের গালিচার উপর পড়ে-থাকা নরম লাল জ্বলজ্বলে একটা বলের মতো সূর্যকে দেখলাম, আগুন-রঙা টুপির মতো, ঘটের মতো, ডিমের মতো, তারপর দুটি ঠোঁটের মতো বাঁকা একটা রেখা শুধু, আর তারও পরে, অনেক, অনেকক্ষণ পর্যন্ত মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা লেগে রইলো আকাশে—একভাবে লেগে রইলো তাও নয়, মাঝে-মাঝে মিলিয়ে গিয়ে দেখা দিতে লাগলো আবার, কখনো এখানে, কখনো ওখানে, কখনো মেঘের ঘোমটায় অর্ধেক লুকোনো, আর কখনো বা হঠাৎ এক টুকরো নীলিমার বুকে উজ্জ্বল।
>
> না—এরোপ্লেনের কাছে হার মানতে হলো শেষ পর্যন্ত ; তার বঞ্চনার যে-দীর্ঘ তালিকাটি তৈরি করেছিলাম, এই আশ্চর্য অস্তরাগের আবেশ তার অক্ষরগুলিকে ঝাপসা করে দিলে। ... এই মেঘ, এই সূর্যাস্ত—এ একেবারেই আশ্চর্য, অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত, যেন কোনো সুখী এবং বর্ণবিলাসী জাদুকরের হাতের ইঙ্গিতে উৎসারিত ; মাটিতে দাঁড়িয়ে যা-কিছু দেখতে পাই আমরা, কি দেখতে পাওয়া সম্ভব, তার কোনো-কিছুর সঙ্গেই মিল নেই এর।

অর্থাৎ তিনি মানতে বাধ্য হলেন যে কিছু স্বর্গীয় সৌন্দর্যের দৃশ্য আছে যা ব্যোমযানে না চাপলে দেখা যায় না। এই উড়ানের আড়াই বছর পরে একটি কবিতায় তিনি যখন লেখেন, 'আবর্তমান কমলালেবুর পরিশ্রমে/ অম্ল-মধুর ইন্দ্রিয়লোক/ সকল দিকে উঠছে জ'মে', তখন আমরা বুঝতে পারি কী ধরণের

অভিজ্ঞতাকে ঢিমে আঁচে জ্বাল দিয়ে এই ক্ষীরের মতো গাঢ় চিত্রকল্প তৈরি হয়েছে।

দেশান্তর-এর ব্যাপক কাভারেজের মধ্যে কয়েকটি হাইলাইটের উল্লেখ করা যাক : জাপানের কোবে শহরে সুকিয়াকি, অর্থাৎ খাঁটি জাপানী কায়দায় ভোজন ; হনলুলুর মধ্যরাত্রে পাহাড়ের আলো-জ্বলা ধাপে-ধাপে সাদা বাড়ির ঝিলিক ; ক্যালিফর্নিয়ায় লেখক হেনরি মিলার এবং তাঁর স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ ; নিউ ইয়র্কে বীট কবি অ্যালেন গিন্সবার্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ; লণ্ডনের এক পাবে বাঙালী বন্ধুদের সঙ্গে ডিনার, যে-পাবে নাকি আড্ডা দিতে আসতেন ডক্টর জনসন, সেখান থেকে উঠে অন্য এক পাবে গিয়ে 'দিলখোলা আড্ডা', যেখানে 'অগ্নিবরণী, ক্ষিপ্র-কক্‌নি-ভাষিণী, সামনের-এক-দাঁত-পড়া, আস্তিন-গোটানো, মার্জারচক্ষু পরিচারিকাটি' যেন চসর অথবা শেক্সপীয়র থেকে উঠে এসেছে ; ডেনমার্কে এলসিনোরের দুর্গ-প্রাসাদে বিচরণ, যা কিনা *হ্যামলেট* নাটককে মনে করিয়ে দেয় ; আমস্টার্ডামের চিত্রশালায় বুদ্ধদেবের প্রিয় চিত্রশিল্পী রেমব্রান্টের ছবি দেখে দিন কাটানো ; রোমে 'কীট্‌স্-শেলি মেমোরিয়াল'-এর তীর্থ দর্শন ; নেপ্‌ল্‌স্-এ হোটেলের ছাদের রেস্তোরাঁ থেকে দেখা সান্ধ্য দৃশ্য—'নিচে দেখা যাচ্ছে আধো চাঁদের মতো উপসাগর, তার গা ঘেঁষে পাহাড় উঠেছে, পাহাড়ের গায়ে-গায়ে ভিলা, উঁচুতে নিচুতে সারি-সারি কাফে, নৃত্যশালা, আলোর মালা, বেহালার সুর উঠে আসছে আমার কানে, দেখতে পাচ্ছি ঘূর্ণ্যমান যুগল—যেন আনন্দের স্রোত বয়ে চলেছে চারদিকে' ; গ্রীসে আক্রোপোলিস দেখে আপ্লুত হওয়া ; কাইরোতে সুবিখ্যাত মিউজ়িয়ম পরিদর্শন, সেখানে মামি-কক্ষে দাঁড়িয়ে বোদলেয়রের কবিতার আরও একটু গভীরে প্রবেশ ; পিরামিডের সামনে এসে দাঁড়ানো, যেখানে 'পাঁচশো ফুট উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু ধ্বংসের স্মরণলিপি—প্রস্তরীভূত, ঘনসংহত, ধ্বংসহীন।'

বিদেশী জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বুদ্ধদেবের অব্যর্থ মন্তব্যগুলি মনেযোগ দাবি করে। জাপানের মধ্যযুগে মেয়েরা যেভাবে শিক্ষিত হতেন, বই লিখতেন, শিল্পকলার চর্চা করতেন, সেই ব্যাপারটা তাঁর কাছ থেকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আদায় ক'রে নিয়েছে। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের ফলে ইংল্যাণ্ড তাঁর অচেনা লাগে নি, কিন্তু আমেরিকায় কয়েকটি জিনিস নতুন ঠেকেছে। তিনি এটা বুঝে নিয়েছেন যে '... আমেরিকায় বসবাস করতে হলে বলবান হওয়াটা বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয় ; এই ভৃত্যহীন দেশে, যেখানে পেশীশ্রমের আর্থিক মূল্য

অনেক সময়ে মস্তিষ্কচালনার চাইতে বেশি, ... সেখানে বাহুবল জিনিশটা প্রায় একটা সামাজিক এবং নৈতিক গুণের পর্যায়ে পড়ে' ; 'এখানে জীবনযাপনের পরীক্ষাটি বড়ো সহজ নয় ; তাতে সসম্মানে পাশ করতে হলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই চাই প্রভূত পেশীবল, গতির ক্ষিপ্রতা, গৃহকর্মে নৈপুণ্য, পুঙ্খানুপুঙ্খে মনোযোগ ; আনমনা বা উদাস ভাবটির প্রশ্রয় নেই এখানে, হস্তপদের ক্ষমতা কম হলে লজ্জা পেতে হয়' ; 'পুরুষ নামক অলস ও সুখলিপ্সু জন্তুকে মার্কিনী রমণীরা যে-ভাবে পোষ মানিয়ে, জোয়ালে ঠেলে, তাঁদেরই সেবায় নিযুক্ত রেখেছেন, এবং যে-রকম অম্লান ও অবিদ্রোহীভাবে পুরুষদের তাতে সম্মত দেখা যায়, তাতে যেন প্রায় সভ্যতার একটি নবপর্যায় সূচিত হচ্ছে' । আমেরিকায় দৈনন্দিন জীবন যাপন এতই কায়িক শ্রম দাবি করে যে বুদ্ধদেব একবার এক তরুণ লেখককে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কী করে আপনারা বই লেখেন, বলুন তো ? অর্ধেক সময় কি ঘরকন্নার কাজেই চলে যায় না ?' জেনেছিলেন যে লেখকদের জন্য কয়েকটা "হোম" বা আশ্রয়গৃহ হয়েছে, যেখানে ঘরে খাবার দিয়ে যায়, কেউ বিরক্ত করে না, আর লেখকরা একটানা লিখে যেতে পারেন। বুদ্ধদেব কবুল করেছেন যে এরকম অবস্থায় 'পাছে কিছু লেখা না হয়, সেই উদ্বেগের পীড়নেই' তিনি বিকল হয়ে যেতেন। তিনি খেয়াল করেছেন যে মার্কিন দেশে বহু মানুষ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে, অনেক নারীপুরুষ অবিবাহিত থাকে। এদিকে 'তারুণ্যই মার্কিন দেশের জীবনধর্ম', যৌবনকে যতদিন সম্ভব টিঁকিয়ে রাখাই সকলের ব্রত, 'বৃদ্ধ' শব্দটি মুখের ভাষা থেকে নির্বাসিত হয়েছে।

তাঁর একটি মর্মভেদী বিশ্লেষণ আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার একটি মৌল নিয়ন্ত্রক বোতামের উপর আঙুল রাখে :

> ... বিজ্ঞান তার মনোহরণ যৌবন হারিয়ে বৈশ্যবৃত্তির সেবা করছে আজকাল, কানদুটোকে উৎসুক রেখেছে সামরিক হুকুমজারির দিকে। নিত্য-নতুন সামগ্রী উদ্ভাবনে আজকের দিনে এই যে তার দুরন্ত ক্ষিপ্রতা দেখছি, তার পিছনে মানবসমাজের কোনো সত্যিকার চাহিদা নেই, আছে ব্যবসাবুদ্ধি, ধনের লোভ, যুদ্ধে জয়ী হবার প্রস্তুতি, বণিকের সঙ্গে বণিকের এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রতিযোগিতার সংঘর্ষ। ... আধুনিক বৈশ্যবিধানে আগে সামগ্রীটাকে উপস্থিত করা হয়, তারপর তার চাহিদা জাগিয়ে তোলা হয় অবিরাম বিজ্ঞাপনের চাবুক মেরে-মেরে। ... বিজ্ঞানের যেটা সাধনার

দিক, জ্ঞানের দিক, সেটাকে মানুষ তেমন স্পষ্ট করে আর দেখতে পাচ্ছে না, বিজ্ঞান বলতে তার মনে পড়ছে সুবিধে, সুযোগ, আয়াসের লাঘব, ব্যসনের বৃদ্ধি, কিংবা কোনো অর্থকরী প্রস্তাব, আর নয়তো কোনো আণবিকতর অস্ত্রের আতঙ্ক। সাধারণ মানুষ ধরেই নিয়েছে যে বিজ্ঞানীর কাজই হলো—যতক্ষণ তিনি হনন-যজ্ঞের সমিধসংগ্রহে ব্যস্ত না আছেন—তার জন্য সময়-বাঁচানো, খাটুনি-বাঁচানো, আরাম-বাড়ানো, আমোদ-জোগানো রাশি-রাশি খেলনা তৈরি করা। খেলনা, নেহাৎই খেলনা, কেননা ওগুলো না-পেয়ে সে যে দুঃখে ছিলো তা নয়, আর পেয়ে যে কোন সুখ হলো, তাও সে ঠিক জানে না।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঘরকুনো মানুষটি একজন রীতিমতো চিন্তাশীল পথিক ছিলেন। সেই পথ-চলা কখনও বাড়িতে ব'সেই, কখনও বা সক্রিয়ভাবে। টানা লিখে যাওয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অসম্ভব পরিশ্রমী, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর মায়াবী টেবিলে সংসক্ত থাকতে প্রস্তুত। ইংরেজীতে যাকে বলে স্ট্যামিনা, সেই জিনিসটা তাঁর ছিলো। মননশীল লেখক ছিলেন ব'লে লেখার পাশাপাশি প্রচুর পড়াশোনা করার জন্যও সময় বার করতে হতো তাঁকে। আর তিনি ভালোবাসতেন কাজের ফাঁকে ফাঁকে দোতলার জানলা থেকে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের জনস্রোত আর ট্র্যাফিকের প্রবাহ দেখতে। ঐ উপায়ে লেখার টেবিলে ব'সে থেকেও তিনি বৃহত্তর নাগরিক জীবনের অংশী হতে পারতেন। এই প্রক্রিয়াকে বলা যায় একরকমের 'প্যাসিভ' বা নিষ্ক্রিয় ভ্রমণ, যা থেকে একজন শিল্পী অনুপ্রেরণা শুষে নিতে পারেন।

বুদ্ধদেবের ভ্রমণগুলি তাঁর সাহিত্যে সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান রেখে গেছে। আগেই বলেছি, *আমি চঞ্চল হে* পড়লে 'চিল্কায় সকাল'-সমেত *নতুন পাতা*-র অনেক বিখ্যাত কবিতার প্রেক্ষাপট খুলে যায়। বিদেশভ্রমণের চিহ্নগুলি পড়তে আরম্ভ করে ১৯৫৩-র শেষভাগ থেকে। ঐ বছরের সেপ্টেম্বরে পিট্‌স্‌বার্গে ছোটদের জন্য কয়েকটি ছড়া লেখা হয়েছে। 'ডলারের ছড়া' কবিতাটি রীতিমতো মজাদার। তিপ্পান্নর ডিসেম্বরে পিট্‌স্‌বার্গের এক দুরন্ত শীতের রাতে তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে 'শীতরাত্রির প্রার্থনা'র মতো এক দুর্ধর্ষ কবিতা। নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঐ উত্তুরে শীতকে প্রত্যক্ষ না করলে ঐ কবিতাটি লিখতে পারতেন না। এর পর

সমুদ্রপথে লেখা হয় 'সমুদ্রের প্রতি—জাহাজ থেকে', লণ্ডনে লেখা হয় অসাধারণ কবিতা 'আবির্ভাব', আবার সমুদ্রপথে 'সমর্পণ' আর 'যাওয়া-আসা'। পরবর্তী পর্যায়ের বিদেশভ্রমণে আমেরিকায় ব'সে লেখা হয়েছে 'রোদনরূপসী', 'প্রান্তবাসী প্রাণ', 'অন্যান্য বীজাণু', 'ইকারুস', 'কেবল তোমাকে নিয়ে'।

দেশান্তর-এর আমেরিকা-বাসের বিবরণের কিছু খুঁটিনাটি 'প্রান্তবাসী প্রাণ' বা 'অন্যান্য বীজাণু'-র মতো কবিতার বক্তব্যকে আলোকিত করে। 'প্রান্তবাসী প্রাণ'-এ সাবওয়ে স্টেশনের ধূসর আর্দ্র মন-খারাপ-ক'রে-দেওয়া প্রান্তিক আবহ উল্লিখিত হয়েছে। পাতাল রেলের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে যে-কথাটা কবি ভুলতে পারছেন না তা হলো জরা-ব্যাধি-মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য আধুনিক মার্কিন মানুষের মরিয়া সংগ্রাম। 'মৃত্যুভয় কার বা নেই, কিন্তু বহু যত্নে, অনেক আগে থেকে, সেই অনিবার্য পরিণামের বিরুদ্ধে দেয়ালের পর দেয়াল তোলার চেষ্টা—তা এই দেশের ও যুগের একটি নূতন মনোভঙ্গি।' এই প্রচেষ্টায় মার্কিন মানুষ অত্যধিকভাবে স্বাস্থ্যসচেতন। 'হোক বিজ্ঞান, হোক বিজ্ঞাপন—কোনো স্বাস্থ্যসম্মত নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলায় মার্কিনীদের জুড়ি নেই জগতে। ... কবিরা যে-ভীষণ পাতালে বার-বার অবতরণ করেছেন তাকে তথ্য হিশেবেও স্বীকার করা শিষ্টাচার নয়। ... যেন মৃত্যুর অস্তিত্ব নেই, এই ভান সার্বিকভাবে স্বীকৃত ...।'

'অন্যান্য বীজাণু'তেও মার্কিন সভ্যতার এই প্রবণতাকে সূক্ষ্মভাবে বিদ্রূপ করা হয়েছে। বক্তব্যগুলি এমনিতেই বোঝা যায়, তবু *দেশান্তর*-এর প্রাসঙ্গিক অংশ আর কবিতাটি পাশাপাশি রেখে পড়লে যোগসূত্রগুলি সহজে ধরা দেয়। সিগারেট-আসক্ত কবি যখন প্রগাঢ় আয়রনির সঙ্গে মন্তব্য করেন : 'সিগারেট ছেড়ে দিয়ে সত্যি যদি অমরতা লাভ করা যায় !'—তখন আমরা তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি ভ্রমণবৃত্তান্তের একটি বিশেষ অংশকে। বুদ্ধদেব যখন প্রথম আমেরিকায় গিয়েছিলেন তখন প্রায় সব প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীপুরুষকে সিগারেট খেতে দেখেছেন, যদিও ধূমপানের সঙ্গে কর্কটরোগের সম্পর্ক নিয়ে ভাবিত হতে আরম্ভ করেছেন তাঁরা সবাই। দ্বিতীয়বার যখন আমেরিকায় গেলেন তখন দেখেন যে সেই সম্পর্ক প্রমাণিত হয়ে গেছে, অতএব অনেকেই ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন—কেউ কেউ আবার তিরিশ-চল্লিশ বছরের অভ্যাসকে অতিক্রম ক'রে। বুদ্ধদেব মন্তব্য করেন : 'প্রায় অতিমানবিক এই সংযম ও মনোবল—আমি অন্তত, অনুকরণে অক্ষম বলে, শতমুখে এর প্রশংসা না করে পারি না ;' তার পর বক্র

ভঙ্গিতে বলতে ছাড়েন না : 'এবং এমন অনুমানও সংগত যে পরবর্তী গবেষণার ফলে এই মত যদি বাতিল হয়ে যায়, বা তাতে দেখা দেয় সংশয়, তাহলে তখনই সিগারেটের কাটতি আবার আকাশে ঠেকবে।'

ঐ একই কবিতায় আমরা শুনি : 'আরশোলা নির্বংশ হ'লে মহান কল্যাণ'। এর পিছনে আছে কোনো-এক মার্কিন মহিলার ভয়ংকর আরশোলা-ভীতির গল্প, তার প্রতিতুলনায় চেলসী হোটেল-নামক বাসস্থানে বাথরুমে দু'-একটি আরশোলা দেখতে পেয়ে বসু-দম্পতীর পরম স্বস্তি : 'যাকে বলে অ্যাট হোম, আমাদের অনুভূতি হলো আক্ষরিক অর্থে তা-ই ; আর আমেরিকা যে আসলে একেবারে নির্মমভাবে নির্বীজ নয় তার প্রমাণ পেয়েও তৃপ্তি পাওয়া গেলো।'

সুবিখ্যাত 'ইকারুস' কবিতাটি বোল্ডার, কলোরাডোতে ১৯৬৪-র গ্রীষ্মে লেখা, তাতে পড়েছে ১৯৬১-র আথেন্স-ভ্রমণের ছায়া। সেই ভ্রমণে দেখেছিলেন : 'আমাদের দুই দিকে পাহাড়ের সারি ও তিন দিকে সমুদ্রের বেষ্টন ; আর এই সব-কিছুর উপর, এক অগাধ অব্রণ নীলিমা থেকে, ঝরে পড়ছে সূর্যাস্তের প্রসাদ, যেন দূরের সঙ্গে দূরতরকে মিলিয়ে দিয়ে।' 'ইকারুস' কবিতায় দূরে ভাসমান একটি নৌযান ছাড়া 'সমুদ্রে আর ক্ষত নেই, নীলিমায় জ্যোতির কম্পন শুধু,/ অব্রণ ভূমধ্যদিন, অফুরান সুবর্ণমদিরা।' 'অব্রণ' বিশেষণটির পুনরাবৃত্তি জানান দিচ্ছে যে এই কবিতায় হানা দিচ্ছে স্মৃতির গ্রীস।

হনলুলুতে লেখা একটি আশ্চর্য কবিতায় আছে ব্লুমিংটন, ইণ্ডিয়ানার একটি স্মৃতি : শান্ত এক রবিবারের সকালে রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়ে কবি শুনেছিলেন কোনো বাড়িতে ফোন বেজে যাচ্ছে, কেউ ধরছে না। ১৯৬৫-র সেপ্টেম্বরে সদ্য ভ্রমণপ্রত্যাগত অবস্থায় পর-পর কয়েক দিনের মধ্যে কলকাতায় ব'সে স্মৃতির নিবিড় রোমন্থন ক'রে লিখেছেন 'নস্টালজিয়া', 'আমার জীবন', 'আমার মিনার', 'তিথিডোর', 'প্রবাসী'-র মতো কবিতা, যেখানে ফিরে ফিরে আসে ভ্রমণলব্ধ নানা টুকরো ছবি। এই পর্বে তাঁর কবিমনের ভূগোল পৃথিবীময় ব্যাপ্ত। তাঁর মন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, দেশ আর বিদেশে ভেদ নেই। মানহাটান-বাভারিয়া-কলকাতা একাকার। বেহালার বস্তির খোলার ঘর, সান ফ্রানসিস্কোর চল্লিশ-তলা হোটেল, আটলান্টিকের গরীয়ান জাহাজ, কলকাতার বর্ষায় আরশোলা-সমেত স্যাঁতসেঁতে বাথরুমও তথৈবচ। ফিরে ফিরে আসে আকাশযাত্রার চিত্রকল্প—অস্তিত্ব যেন এয়ারপোর্টের হোটেলে এক রাত্রির জন্য আতিথ্যগ্রহণ, আবছা ঘুমে শোনেন রাতভর প্লেনের গর্জন, যেন তিনি মহাশূন্যে ভাসমান, বা যেন তাঁর জীবনটাই এক

বিশাল বিমানবন্দর, যেখানে মিনিটে-মিনিটে প্লেন নামে আর উঠে যায়।

সে কোন্ দেশ, যার বিরহে এই কষ্ট ! আমি কি ছিলাম
সেখানে কোনোদিন, না কি এখনো দেখিনি, না কি আমি
সেখানেই আছি ?
আমার চোখ থেকে ফলের মতো ঝুলছে— সে কি স্মৃতি ?
.....
ছায়া দেখি সেই পাখিদের, আমার হৃদয় নিয়ে যারা
উড়ে গিয়েছিলো। অভিজ্ঞ তারা, সব সমুদ্র চেনে,
সব সৈকতে নেমেছে, সব নগরে বন্ধু আছে তাদের।
.....
সে কোন দেশ, যেখানে আমি যেতে চাই ?
সে কি যাওয়া, না ফেরা ? না কি সন্ধান শুধু ?
('নস্টালজিয়া')

'তিথিডোর' কবিতাটিতে যুগপৎ হানা দেয় হনলুলু, নেপ্‌ল্‌স্ আর কলোরাডোর স্মৃতি। হনলুলুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তর্কাতীত, তবু কবির আক্ষেপ : 'হনলুলু, তুমি/ নাপোলি হ'লে না কেন ?' প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে যদি যুক্ত হতো সাংস্কৃতিক বৈদগ্ধ্যের ইতিহাস, তবেই তা সোনায় সোহাগা হতো বুদ্ধদেবের পক্ষে। এই ব্যাপারটা নিয়ে দময়ন্তী আলোচনা করেছেন তাঁকে লেখা তাঁর বাবার চিঠিপত্র সম্পাদনার সূত্রে। আমিও আমার নতুন বই *তিসিডোর*-এ প্রসঙ্গটা ছুঁয়ে গেছি, তাই এখানে আর কথা বাড়াচ্ছি না। কলোরাডোর অনুষঙ্গে আসে একটি মোটরযাত্রার স্মৃতি—'নীলতম অমল/ আকাশে নিস্পন্দ আলো, অতল স্বচ্ছতা, তীক্ষ্ণ রৌদ্রে/ প্লাবিত অফুরান দিন ...', যার মধ্যে আমরা পেয়ে যাই 'ইকারুস'-এর সংকেত, যেটি কলোরাডোতেই লেখা হয়েছিলো। 'প্রবাসী' কবিতাটিতে অন্নপূর্ণা বা আন্নির জীবনের কথা বলতে গিয়ে একাকার হয়ে যায় ব্রুকলিন আর রাজশাহী।

তাঁর একেবারে শেষ পর্বের কবিতায়, যেমন 'সেতুবন্ধ', 'স্বাগতবিদায়', বা 'সাবিত্রীর জন্য কবিতা'য়—বলা বাহুল্য এগুলি কলকাতায় লেখা—এই কাছে-দূরে মিশে যাওয়ার ব্যাপারটা অটুট থাকে। অভিজ্ঞ পর্যটকের ব্যাপ্ত বিশ্বচেতনায়

আঞ্চলিক আর সুদূরের ভেদ ঘুচে যায়, তাঁর মনের মধ্যে তারা প্রতিবেশী। স্মৃতির পর্দায় যেমন জ্বলে দূর বিদেশের চিত্রগুলি, এপারে ব্রুকলিন আর ওপারে মানহাটানের দেহরেখা, মাঝখানে বন্দর, জাহাজ, সেতু, হেলিকপ্টার, তেমনি ফিরে ফিরে আসে প্রথম জীবনের মাতৃক্রোড় পূর্ববঙ্গ, যা তখন কাগজে-কলমে 'বিদেশ'-এ পর্যবসিত, সেখানকার বাঁশবন আর পানাপুকুরে বৃষ্টি, বুড়ীগঙ্গার ধারে আবেদ-এর বেকারির সুগন্ধ। মানহাটান, বালিগঞ্জ, নোয়াখালি, পুরানা পল্টন—কবির মানসিক ভূগোলে সবই পরস্পরের কাছাকাছি। তা ছাড়া সব ঘটনাই যেহেতু ঘটে স্পেস-টাইমের বলয়ে, স্মৃতি তাই কেবল একাধিক স্থানকে যুক্ত করে না, একাধিক কালকেও যুক্ত করে। স্মৃতির ভ্রমণে কেবল পুরোনো জায়গায় নয়, হারিয়ে-যাওয়া মানুষগুলোর কাছেও ফিরে যেতে হয়, জীবিত আর মৃতদের মধ্যে সেতু বাঁধতে হয়। জীবন তাই ধরা দেয় যুগপৎ এবং ক্রমাগত স্বাগত জানানোর আর বিদায় জানানোর লীলারূপে। 'সাবিত্রীর জন্য কবিতা'টিতে মৃত্যুচিন্তার অনুষঙ্গে হানা দিয়েছেন অকালমৃত ইংরেজ কবি কীট্‌স্, যিনি অসুস্থ অবস্থায় রোমে মারা গিয়েছিলেন ১৮২১ খৃষ্টাব্দে, ছাব্বিশ বছর পূর্ণ হবার আগে। ১৯৬৮-তে এই কবিতাটি লেখার অল্প আগেই বুদ্ধদেব তাঁর সর্বশেষ বিদেশযাত্রায় রোম ছুঁয়ে এসেছিলেন। সেটাই অবশ্য তাঁর প্রথম রোমদর্শন নয়। তিনি তার আগে আরও দু'বার রোমে গিয়েছিলেন, এবং সেখানে তাঁর প্রিয় তীর্থস্থান ছিলো কীট্‌স্ আর শেলির স্মৃতিতে নিবেদিত মিউজ়িয়ম। সেই স্মৃতিভবন সম্পর্কে *দেশান্তর*-এ বিশদ প্রতিবেদন আছে।

একটা জিনিস খেয়াল করবার মতো : তাঁর কবিতায় দেশী ভূচিত্রের পাশাপাশি বিদেশে দেখা ভূদৃশ্য যখন ধরা পড়ে, তখন সেইসব খুঁটিনাটি তাঁর কবিতায় যেভাবেই ঢুকে থাকুক না কেন,—প্রত্যক্ষ প্রতিবেদনে কিংবা প্রথমে স্মৃতিস্থ এবং পরে পুনরুজ্জীবিত হয়ে,—সেগুলি কিন্তু সর্বদাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় অবসাদহীন বন্ধুত্বের জানান দেয়, মূর্তিপরিগ্রহ করে মর্মগ্রাহী এবং লক্ষ্যভেদী ভাষায় : যেমন, 'আকাশে জুন মাস উজ্জ্বল', বা 'সদ্য-ফোটা সবুজ পাতা, দুটো রঙিন/ রবিন্ পাখি', বা 'বাষ্পলীন, ধবল, সরল ডিসেম্বরে/ বিস্মৃত, চক্রান্তকারী, নিরুদ্দেশ বসন্তের মতো', বা 'ঋতু গ্রীষ্ম, তরুণ সুন্দর জুন, জানলায় সমুদ্রসমীর—'। জুন মাসের প্রসঙ্গে 'উজ্জ্বল', 'তরুণ সুন্দর', বা ডিসেম্বরের প্রসঙ্গে 'ধবল, সরল' বিশেষণ বাংলার নিজস্ব দিশি অনুষঙ্গে প্রযুক্ত হয় নি, প্রযুক্ত হয়েছে—অব্যর্থভাবে—বিদেশী অনুষঙ্গে। আন্তর্জাতিকভাবে

ব্যবহৃত খৃষ্টীয় ক্যালেণ্ডারের মাস-নামগুলিতে উত্তরের ঋতুর জন্য যে-ব্যঞ্জনা দরকার তা যোগ করেছেন, কিন্তু গ্রীষ্মমণ্ডলীয়-জলবায়ু-সঞ্জাত বাংলাভাষার গায়ে তা নতুন চাদর। বঙ্গীয় জুনমাসের থেকে এই জুন যে ভিন্ন রূপের সে-বিষয়ে তিনি এতদূর সচেতন যে 'ঋতু গ্রীষ্ম, তরুণ সুন্দর জুন, জানলায় সমুদ্রসমীর—' ব'লেই যোগ ক'রে দেন : 'জুন, কিন্তু আসন্ন আষাঢ়।' তার পর দ্রুত সফরে চ'লে যান শৈশবের আষাঢ়ের স্মৃতিতে : '... ঝর্ঝরমুখর ভোর, উঠোনের উপরে আকাশ ঝাপসা,/ পুকুরে প্রফুল্ল পানা, বাঁশবন বৃষ্টিতে ধূমল'। মন যেভাবে এক লহমায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উড়ে যেতে পারে, কবির ভাষাও পারে সেভাবে উড়ে গিয়ে দুই ভৌগোলিক অঞ্চলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুই স্মৃতিগুচ্ছের মধ্যে সেতু বাঁধতে। বিদেশের নৈসর্গিক দৃশ্য তিনি কতটা মনোযোগ দিয়ে দেখে আত্মস্থ করেছেন তা বোঝা যায়। ভিন্ন অক্ষরেখার দৃশ্য বাংলাভাষায় কিভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে সে-ব্যাপারে আমি অন্ততঃ ডায়াস্পোরার বাঙালী হিসেবে তাঁর কাছ থেকে কিছু শিখেছি। ভ্রমণের ছবি প্রসঙ্গে 'অনুরাধা' থেকে কয়েকটি লাইন আগেই উদ্ধার করেছি। আরও কিছু লাইন উদ্ধার করা যাক :

চলেছি নীল হাওয়ায় ভেসে
এরোপ্লেনে
পাহাড়-বন-শহর-ভরা
বসুন্ধরায় সঙ্গে টেনে।
স্বচ্ছ ভোর, গোলাপি রোদ,
ঝাপসা মাটি,
বইয়ের খোলা পাতায় মেশা
কফির বাটি
পেরিয়ে যায় দাবার ছকে
গির্জে, হোটেল, নির্জনতা,
ইতস্তত তুষার-চূড়ায় আর-বছরের
তন্ময়তা।

এরোপ্লেনের জানলা থেকে দেখা ভূদৃশ্যের এমন সুদক্ষ বর্ণনা বাংলা কবিতায় বিরল। ছন্দের অব্যর্থ ব্যবহারে উড়ানের গতিবেগও লাইনগুলির মধ্যে সঞ্চারিত

হয়েছে। যেন ঘাড় বাঁকিয়ে তির্যক ভঙ্গিতে দেখছেন, আবার কফির কাপটাও সামলাচ্ছেন, যাতে বইয়ের খোলা পাতায় কফি না প'ড়ে যায় ! তার পর আছে দৃশ্যের মহান সৌন্দর্যকে শুষে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট দার্শনিকতার উন্মোচন :

আবর্তমান কমলালেবুর
পরিশ্রমে
অল্প-মধুর ইন্দ্রিয়লোক
সকল দিকে উঠছে জ'মে।
স্বল্প আয়ু, ধ্রুপদী কাল
অপরিমাণ,
অথচ এক আবেগময়
ব্যাকুল যান
ফেনিয়ে তোলে সাগর, বন,
নগর, দ্বীপ, শৈলশ্রেণী,
এমনকি দূর ছায়াপথের পরমাণুর
দীপ্ত বেণী।

মনে রাখতে হবে যে এরোপ্লেনের জানলায় ব'সে লেখা হয় নি এই কবিতা। এর সত্তা স্মৃতির রসায়নে গাঁজিয়ে-তোলা—সেই স্মৃতি, কবির কাছে যা দেবী।

কেবল কবিতায় নয়, কথাসাহিত্যেও বুদ্ধদেব তাঁর ভ্রমণস্মৃতিকে বিচক্ষণভাবে ব্যবহার করেছেন। 'সুপ্রতিম মিত্র'-নামক ছোট গল্পে দার্জিলিঙের সেটিঙের চমৎকার ব্যবহার আছে। এখনকার সুপ্রতিম মিত্র আপাতদৃষ্টিতে একজন ভাঙাচোরা ব্যর্থ মানুষ, যার মধ্যে একদা অনেক সম্ভাবনা, অনেক প্রতিশ্রুতি ছিলো। কাহিনীটার বিবৃতিদাতা যে, সেই মহিম-নামক লোকটি কলেজ-জীবনে সুপ্রতিমের সহপাঠী ছিলো, এবং সেই পর্বে সে সুপ্রতিমকে 'জিনিয়াস' ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে নি। অথচ সুপ্রতিম টাকা রোজগার করতে পারে নি, লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে নি, তার ঝলমলে বিয়েটাও ভেঙে গেছে, সে এখন দার্জিলিঙে ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে কাঞ্চী-নান্নী একজন বালবিধবা নেপালী মেয়ের সঙ্গে থাকে। অনেক বছর বাদে দার্জিলিঙে দুই প্রাক্তন সহপাঠীর দেখা।

মহিম তাকে পাঁচশো টাকাব একখানা চেক দিয়ে অর্থসাহায্য করলে সুপ্রতিম তাকে এক-বাক্স পাণ্ডুলিপি দেয়, যদি পুরোনো বন্ধু তাদের কোনো সদগতি করতে পারে। করতে না পারলেও কোনো ক্ষতি নেই। এই বাক্সে সুপ্রতিমের সর্বস্ব ন্যস্ত, কিন্তু এখন সে নিরাসক্ত। সে জানে সে আর কিছু ক'রে উঠতে পারবে না। কিছু পাণ্ডুলিপি প'ড়ে মহিম এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় যে সুপ্রতিম মিত্র বাংলার 'একজন অসাধারণ লেখক', এতটাই অসাধারণ যে 'হয়তো তার বই এ-মুহূর্তে ছাপানোই চলবে না।' ১৯৩৯ সালে লেখা এই গল্প ; বুদ্ধদেব নিজে তখন সাহিত্যজগতে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত, অনেকাংশে সফলও বটে, আবার সেন্সরশিপ কাকে বলে তাও জেনে গেছেন অনেক দিন আগেই। কলকাতার সাহিত্যপ্রকাশন-জগতের বিপরীত মেরুতে সুপ্রতিমকে স্থাপন ক'রে সেই অনুষঙ্গে সংক্ষিপ্ত আঁচড়ে নিপুণভাবে এঁকেছেন দার্জিলিঙের লোকেশনটিকে, আজকের সমালোচনার ভাষা অবলম্বন ক'রে বলা যায়, তাকে দেখিয়েছেন এক 'অপর' অস্তিত্বের আশ্রয়রূপে।

আবার সুপ্রতিমের বিপরীতে ১৯৬২ সালে লেখা 'তুমি কেমন আছো ?' গল্পটির নায়ক একজন সফল কৃতী এঞ্জিনীয়র, যে তার মনের গভীর নির্জনে সযত্নে লালন করে এক সুকোমল রোম্যান্টিক ফ্যান্টাসিকে। সেখানে তার ভ্রমণাভিজ্ঞতা তার সঙ্গী। অবনীশ ঘোষাল এত দেশ ঘুরেছে যে এখন তার ভুল হয়ে যায় কোন্‌টা কোন্ দেশ, কোন্‌টা কোন্ সময়। 'পাহাড়ের চুড়োয় বাংলোবাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখেছিলাম—সে কি ম্যানিলায়, না কাপ্রিতে ? কোথায় সেই সরাইখানা যেখানে ছিলো গনগনে কাঠের আগুন, সেকেলে ও স্বল্প আসবাব, সুস্বাদু শাদাশিধে খাবার, স্নিগ্ধ মদ, আর বাইরে বরফ-পড়া রাত্রি, নিঃশ্বসিত হিম অরণ্য ? টিরল ? ডেনমার্ক ? না কি বিগ্ সুর্ ?' 'নস্টালজিয়া' আর 'তিথিডোর' কবিতা-দুটির সঙ্গে ভাবসাদৃশ্য লক্ষণীয়। ভ্রমণের ব্যাপক অভিজ্ঞতা কি সকলের জন্যই ঋদ্ধি আনে, না কি কাউকে কাউকে রীতিমতো ক্লান্ত ক'রে দেয়, তাদের স্মৃতিগুলো তালগোল পাকিয়ে যায় ?—এই প্রশ্নটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন বুদ্ধদেব এই গল্পে। আত্মকথনের শেষে অবনীশ ঘোষাল নিজের জন্যে যে-মুক্তি কল্পনা করে সেখানে অপাপবিদ্ধ প্রেম আর ছুটির ধারণার সঙ্গে মিলিয়ে দূরের দৃশ্য এক রোম্যান্টিক ভূমিকা পালন করে, তারা পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে, আবার পরমুহূর্তেই জেগে ওঠে সংশয় :

> একদিন ছুটি নেবো আমি—নিতেই হবে। এখান থেকে চ'লে যাবো—যেতেই হবে। কোথাও কোনো বারান্দায় বসবো বেতের চেয়ারে, সামনে সমুদ্র। নীল সবুজ বেগনি-রঙা চঞ্চল জল, ঢেউয়ের পর ঢেউ, ঝাপসা দূর। কাজ নেই, অলস আমি ; ভাবনা নেই, অলস আমি ; গতি নেই, অলস আমি ; অথচ আমি সকাল, বিকেল, সন্ধ্যাকে আর ভয় পাই না। কোনো কাজ নেই, আর কাজ নেই ব'লে ক্লান্তিও নেই, এমন কোথাও যেতে চাই। যেখানে সময় আছে সব সময়, কিন্তু সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে হয় না, এমন কোথাও যেতে চাই। কোথায় সেই দেশ, সেই সমুদ্র, সেই নীলিমা ? যেখানে তুমি আছো, সেখানে। ভরা ষোলো তুমি, গায়ে তোমার শিশিরের গন্ধ, মুখ তোমার গোলাপি রোদে উজ্জ্বল, আলোর মতো, আলো ক'রে আছো এই জগৎ। তুমি আমার পাশে এসে বসলে। —কিন্তু এমন যদি হয় যে তুমি নেই ?

'চিল্কায় সকাল' থেকে 'অনুরাধা' পর্যন্ত বুদ্ধদেবের কবিতার জগতের সঙ্গে এই রোম্যান্টিকতার সম্পর্ক সুনিবিড়। মনের একটা কোণে, যেখানে তিনি চিরযুবক, সেখানে সুদূর সুন্দর কোনো স্থানচিত্রের সঙ্গে শান্তি, স্বস্তি এবং একটি শাশ্বতীর দিকে উদ্দিষ্ট অনাবিল প্রেমের মাধুর্য গ্রন্থিত হয়ে আছে তাঁর কবিচিত্তে। কিন্তু আরেক দিক থেকে দেখলে, পরিণত পরিব্রাজক বুদ্ধদেব আর তাঁর সৃষ্ট চরিত্র এই কর্মক্লান্ত এঞ্জিনীয়র অবনীশ ঘোষালের মধ্যে একটা তাৎপর্যপূর্ণ দূরত্ব রয়েছে। পরিণত বয়সের ভ্রমণে বুদ্ধদেব কর্মহীন নির্জলা ছুটির অবকাশ খোঁজেন নি, নিরলসভাবে খুঁজেছেন নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন জ্ঞানের ঋদ্ধি, নতুন সাংস্কৃতিক পরিবেশের স্বাদ, নতুন লেখার জন্য মনের খোরাক। লেখাই ছিলো তাঁর জীবনের হৃৎস্পন্দন, সেই কাজ থেকে মুক্তি চান নি তিনি কখনো। অবনীশের সঙ্গে তাঁকে তাই পুরোপুরি 'আইডেন্টিফাই' করা যায় না।

গোলাপ কেন কালো উপন্যাসের এক জায়গায় বুদ্ধদেব লণ্ডনের স্মৃতির সঙ্গে নিপুণভাবে মিশিয়ে দিয়েছেন বোদলেয়রের প্যারিসকে। *বিপন্ন বিস্ময়*-এর দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীপতির সকালের ঘুমের স্বপ্নের মধ্যে এক অনবদ্য গদ্যকবিতাকে জেগে উঠতে দেখি আমরা, যেখানে রত্নের মতো গ্রথিত হয়েছে লেখকের বিশ্বভ্রমণের টুকরোটাকরা। বেশ কায়দা ক'রে আরম্ভ করেছেন শ্রীপতির স্বপ্নটা :

> ... একটা স্বপ্ন দেখছিলো বোধহয়—কোনো শহর, কোনো ঘর, খুব উঁচুতে, মনে হয় যেন চেনা, যেন সে কখনো ছিলো সেখানে—কোথায় ? ন্যুয়র্কের এম্বাসি হোটেল ? সান ফ্রানসিস্কোর কার্লটন ? কান্ ? নেপলস ? না—অত উঁচুতে সে ঘর পায়নি কোথাও, কোনো জানলা থেকে অমন দৃশ্য দ্যাখেনি। অন্য কোথাও—সাধারণ যাতায়াতের পথে নয়, হয়তো প্যাসিফিকের কোনো দ্বীপ, দক্ষিণ আমেরিকার কোনো রাজধানী। কিন্তু সে তো ও-সব দেশে যায়নি কখনো।

শ্রীপতি না গিয়ে থাকতে পারে, তার স্রষ্টা তো গিয়েছেন, তাই তাঁরই স্বপ্ন অনায়াসে সঞ্চারিত হতে পারে সৃষ্ট চরিত্রের ঘুমের ভিতরে। অবশ্য দক্ষিণ আমেরিকার কোনো রাজধানীতে তিনিও যান নি, যতদূর জানি, কিন্তু সেরকম ডিটেল ঢুকিয়ে দেওয়া তো উপন্যাসকারের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। প্যাসিফিকের বিশেষ একটি দ্বীপে তিনি অবশ্যই গিয়েছিলেন, এবং এর পরেই শ্রীপতির স্বপ্নের এক দুর্ধর্ষ বর্ণনায় যে-শহরের আদল ফুটে ওঠে তার মধ্যে, আমার বিশ্বাস, হনলুলু তো আছেই, মনে হয় নেপ্‌ল্‌স্‌ও কিছুটা আছে।

নীলাঞ্জনের খাতা উপন্যাসের প্রথম খসড়ার প্রকাশ পত্রিকায় ১৯৫৬ সালে, পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯৬০-এ। এই উপন্যাসে ফেলে-আসা পূর্ববঙ্গের স্মৃতি আর প্রথম বিদেশভ্রমণের স্মৃতিকে বেণীবদ্ধ করেছেন বুদ্ধদেব। একদিকে আছে হুতোমগঞ্জ, যার মধ্যে লক্ষ্যভেদী বর্ণনায় ধরানো আছে পুরানা পল্টনের স্মৃতি, জলপথে ঢাকা-বরিশাল যাত্রার স্মৃতি, স্টীমারের রান্না আর এঞ্জিনরুমের স্মৃতি। 'কুইন মেরি' জাহাজের এঞ্জিনরুমের স্মৃতিও হানা দিচ্ছে ব'লে মনে হয় ! অন্যদিকে আছে প্যারিস, নিউ ইয়র্ক, কলাম্বিয়া থেকে দেখা হাডসন নদী, নেপ্‌ল্‌স্‌, ক্যালিফর্নিয়ায় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে দেখা 'বিগ্‌ স্যুর্‌'-এর স্মৃতি, পাহাড়ের উপরে কাঠের বাড়ি, হেনরি মিলারের আদলে আঁকা এক চিত্রশিল্পী। এই আশ্চর্য বন্ধনের সাহায্যে সংশ্লেষিত হয়েছে পথিক-অস্তিত্বের বিশেষ দার্শনিকতাটি :

> কলকাতা, বাংলাদেশ, আমার বাংলা, সোনার বাংলা। সোনার নয় তা তো দেখতে পাচ্ছি, আর কোন অর্থে আমার ? যাদের মধ্যে জন্মেছিলাম তারা

> কেউ নেই, সে-দেশ নেই, পূর্ববঙ্গ নেই। প্যারিস, ফ্র্যাঙ্কফর্ট, মিলান বা লস্ এঞ্জেলস-এর এয়ার-পোর্টে নামতে যে-রকম, দমদমেও তাই। সবই বিদেশ, সবই স্বদেশ। একটা বাসস্থান চাই, বাংলায় যাকে বলে মাথা-গোঁজার জায়গা : এই তো ? জীবন তো সব মনের মধ্যে চলতে থাকে ; কোথায় ঘুমুচ্ছি, কী খাচ্ছি, তাতে কী এসে যায় ?
>
> .....
>
> যে-কোনো সময় এরোপ্লেন দেখলে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে আমার মন। ঐ অপরিসর যানের মধ্যে কাটানো ঘণ্টাগুলি, বই, কফি, তন্দ্রা, আর সসাগরা বসুন্ধরাকে সঙ্গে টেনে নিয়ে চলার অনুভূতি : ঐ বোধহয় সবচেয়ে সুখের সময় আমার জীবনের। কোনো নতুন দেশে পৌঁচচ্ছি, এই বোধটাই আশ্চর্য, পৌঁছলে পরে নতুন কিছু নেই। পথ আর ভ্রমণের গতি : সেটাই সব। আসল কথা, কোথাও কোনো শিকড় নেই আমার ; ভেসে-ভেসেই জীবন কেটে যাবে।

খেয়াল করুন, উপরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় টুকরোটিতে ভ্রমণবিষয়ক বীজ-কবিতা 'অনুরাধা'র এক-ঝলক হাওয়া আবারও কিভাবে খেলে যায়।

ব্যক্তিগতভাবে *নীলাঞ্জনের খাতা*-র কাছে আমি একটি ছোট্ট ব্যাপারে ঋণী। বুদ্ধদেবের শেষ পর্বের কবিতা 'সন্ধিলগ্ন'-এ নামোল্লেখ না ক'রে একটি ভাস্কর্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আমার অনূদিত বুদ্ধদেবের কবিতাগুচ্ছের মধ্যে এই কবিতাটিও আছে। এটি যখন অনুবাদ করেছি তখন কবিতায় বর্ণিত নামহীন ভাস্কর্যটির উৎস কী হতে পারে সে-সম্পর্কে বিস্তর মাথা ঘামিয়েছি। গবেষণা করার পর আমার মনে হয়েছে যে যুগলমূর্তির ঐ বর্ণনায় রদ্যাঁ-র *L'Eternelle Idole* এবং রদ্যাঁ-র ভাস্কর-বান্ধবী কামিল ক্লোদেলের গড়া অন্য দুটি যুগলমূর্তির ছায়া আছে। বর্ণনা এত আনুপুঙ্খিক যে বোঝা যায় কবি কেবল স্মৃতি থেকে বলছেন না, তাঁর সামনে কোনো ছাপা ছবি আছে। *নীলাঞ্জনের খাতা* তখনও পড়ি নি। উপন্যাসটি পড়ার পর বুঝলাম, অন্ততঃ রদ্যাঁ-র গড়া ভাস্কর্যটির কোনো ছবি উপন্যাসকারের কাছে নিশ্চয়ই ছিলো। উপন্যাসে তাকে বলা হয়েছে 'চিরন্তনী প্রতিমা', *L'Eternelle Idole*-এর যথাযথ অনুবাদ। নীলাঞ্জন বলে যে ভাস্কর্যটি সে রদ্যাঁ মিউজ়িয়মে দেখতে পায় নি। হয়তো অন্য কোথাও দেখেছিলো আগে, আবার দেখতে চেয়ে বিফলমনোরথ হতে হয় তাকে। অগত্যা তার একটা ছাপা

ছবি সে কিনে নেয়। সেটি দাঁড় করিয়ে রেখে সে যে-বর্ণনা দেয়, 'সন্ধিলগ্ন'-এ দেওয়া বর্ণনার সঙ্গে তার খুঁটিনাটি মিলে যায়। বোঝা যায়, ভ্রমণলব্ধ ডিটেলটিকে একবার গদ্যে, আরেকবার কবিতায় গুঁজে দিয়েছেন শব্দশিল্পী।

বুদ্ধদেবের ভ্রমণবিষয়ক চিন্তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য আকর হলো কনিষ্ঠা কন্যাকে লেখা তাঁর চিঠিপত্র, যেগুলি দময়ন্তী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন। এই চিঠিপত্রের সংগ্রহ আমি আমার নতুন বই *তিসিডোর*-এ যথেষ্ট ডিটেলে ব্যবহার করেছি ব'লে আজকে সে-বিষয়ে বেশী কিছু ব'লে সময় নেবো না। সংক্ষেপে বলি যে বিদেশভ্রমণ বুদ্ধদেবকে কিভাবে একজন উদার, পরমতসহিষ্ণু, বন্ধুবৎসল, বিশ্বসচেতন, জিজ্ঞাসু, আধুনিক মনের মানুষ ক'রে তুলতে সাহায্য করেছিলো তার অজস্র সাক্ষ্য এই চিত্তজয়ী পত্রগুচ্ছে ছড়িয়ে আছে। বইটি থেকে দুটি মাত্র দিঙ্‌নির্ণায়ক অংশ এখানে উদ্ধার করবো। প্রথমটি ৩রা অক্টোবর ১৯৬২-তে লেখা একটি চিঠি থেকে ; দময়ন্তী তখন আমেরিকায় পড়াশোনা করতে গেছেন, আর বুদ্ধদেব কলকাতায়, যাদবপুরে কর্মরত :

> ... তোর যারা আত্মীয় বা বন্ধু বা স্বজন—তারাই তোর সব, জগতের লোক তোর কিছুই নয়, এই মোহকে কখনোই স্থান দিতে নেই। আত্মীয়পোষিত গ্রাম্য জীবন কাটাবার বেলা কতকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, সেই মনোভাব আধুনিক সভ্যতার বিরোধী। সত্য, যে-দেশে আমরা দৈবাৎ জন্মেছি ও বড়ো হয়েছি, বাল্যকাল থেকে দেখেছি ও ভালোবেসেছি যাদের, নানা প্রত্যক্ষ স্বার্থের বাঁধনে যাদের সঙ্গে আমরা জড়িত, তাদের সঙ্গে একটা মৌলিক ও অনতিক্রম্য সম্বন্ধ থাকে আমাদের, মাতৃভাষা যাদের সঙ্গে এক, তাদের সঙ্গেও। কিন্তু তাই ব'লে আর কেউ আমার কিছু নয়—এ-কথা, তোর কথা, আমার কথা, হ'তেই পারে না। 'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে'—এটা কথার কথা নয়, আক্ষরিক অর্থে সত্য। সেই বিশ্বগৃহ আবিষ্কার করেছে আধুনিক মানুষ—যুদ্ধ সত্ত্বেও, আণবিক বোমার বিভীষিকা সত্ত্বেও, সর্বদেশ ও কালের মধ্যে কী-রকম যোগাযোগ চলছে তা দেখছিস। বরং আমার মনে হয় যে পথ চলতে চলতে যে-সব ক্ষণিকের বন্ধুতা ও ভালোবাসা আমরা পেয়ে থাকি, তার একটি বিশেষ মূল্য ও তাৎপর্য আছে—তা ঘোষণা করে মানুষের মহিমা, তা জানিয়ে দেয় যে মানুষ

মানুষকে ভালোবাসে ও আকাঙ্ক্ষা করে—আর কোনো কারণে নয়, শুধু মানুষ ব'লেই। এরকম কত সুখস্মৃতি আমার মনে জ'মে আছে—কত না-বলা কৃতজ্ঞতা, কত বিদেশী মানুষ যাদের নাম, মুখ কিছুই আমার মনে নেই, মুহূর্তের জন্য তাঁদের হৃদয়ের স্পর্শ যে পেয়েছিলাম সেই কথাটা ভুলে গিয়েও ভোলা যায় না।

আমার দ্বিতীয় উদ্ধৃতি এর মাত্র কয়েক দিন পরেই ২৩শে অক্টোবর ১৯৬২-র একটি চিঠি থেকে :

... কাল থেকে এই কথাটা ভাবতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে যে আমার বন্ধু আছে নানা দেশে—তাঁরা আমাকে মনে রেখেছেন, আমাকে ভালোবাসেন ;—আমার এই অসফল জীবনের এটা একটা বড়ো সার্থকতা, এর জন্যে ভাগ্যের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি আরো অনেকবার বিদেশে যেতে চাই, চাই এই সব গুণী ও সজ্জনের সঙ্গসুখ, তাঁদের হৃদয়ের স্পর্শ চাই। ... তোর মধ্যে দিয়ে প্রতীচীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আরো একটু দৃঢ় হ'লো—এখন ভগবান করুন, প্রাচী ও প্রতীচীতে যেন শান্তি বিরাজ করে।

এই মনোভাবটিকে আমরা অনায়াসেই বাংলার রেনেসাঁসের মূলধারার প্রসারণ ব'লে চিনতে পারি, এবং এখানে ভ্রমণশিল্পী বুদ্ধদেব যথার্থভাবেই পূর্বসূরি রবীন্দ্রনাথের সুযোগ্য উত্তরসাধক।

———————————

এই আলোচনায় নিম্নলিখিত বইগুলি ব্যবহৃত হয়েছে :

বুদ্ধদেব বসু, *কবিতা-সংগ্রহ* (বিভিন্ন খণ্ডে), দে'জ পাবলিশিং-কর্তৃক বিভিন্ন বছরে প্রকাশিত।
——, *দশটি উপন্যাস*, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪।
——, *প্রবন্ধসমগ্র* ১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৫।
——, *প্রবন্ধসমগ্র* ২, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭।

——, *আমার ছেলেবেলা*, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স-এর সংস্করণ, ১৯৮৯।
——, *বুদ্ধদেব বসুর চিঠি : কনিষ্ঠা কন্যা রুমিকে*, দময়ন্তী বসু সিং-কর্তৃক সম্পাদিত, বিকল্প, ২০০৬।
——, *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, ২০০০।
——, *বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ*, নবম খণ্ড, গ্রন্থালয়, ১৯৮৪।
——, *ভাসো, আমার ভেলা*, নতুন সংস্করণ, এবং মুশায়েরা, ২০১০।
প্রতিভা বসু, *জীবনের জলছবি*, শ্রাবণ ১৪০৩-এর মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স।

নন্দিনী গুপ্তর করা *সব-পেয়েছি-র দেশে*-র অনুবাদের প্রাপ্তিস্থল :
http://www.parabaas.com/BB/articles/pNandini_SPDCh1.html
বুদ্ধদেবের সঙ্গে হান্নেলে পোহ্‌য়ানমিয়েসের কাল্পনিক সংলাপটির প্রাপ্তিস্থল :
http://www.parabaas.com/rabindranath/articles/pHannele.html

বুদ্ধদেবের কোনো কোনো গল্পের ক্ষেত্রে দে'জ-এর *শ্রেষ্ঠ গল্প* সংস্করণ আর *ভাসো, আমার ভেলা*-র সাম্প্রতিক এবং মুশায়েরা সংস্করণের মধ্যে অল্পস্বল্প পাঠভেদ লক্ষ্য করেছি। তা ছাড়া বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে বানানরীতির কিছু ভেদও আছে। অসমাপিকা ক্রিয়াপদে বুদ্ধদেব যে-ঊর্ধ্বকমা ব্যবহার করতেন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির মুদ্রণে তা বর্জিত হয়েছে। উদ্ধৃতিগুলো যখন যেখান থেকে নিয়েছি তখন সেখানকার বানান বজায় রাখার চেষ্টা করেছি।

Published in Parabaas September 21, 2010
http://www.parabaas.com.
Copyright: Ketaki Kushari Dyson